KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৭৭/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯
Collection : KLMLGK	Publisher : গৌরাঙ্গ সুন্দর দে (1, 2) / অভিজিৎ সরকার (1/4, 5)
Title : অত্বর (ATWAR)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 1 2 1/4 5	Year of Publication : ১৩৭২ (প্রথম সংকলন) ১৩৭৬ (দ্বিতীয় সংকলন) ১৩৭৬ (শারদ ১৩৭৪ (পঞ্চম সংকলন)
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অত্বর কার্যন (1)(2) শ্যামসুন্দর দে, শুভেন্দু ঘোষ (1/4) অভিজিৎ সরকার, শুভেন্দু ঘোষ (5)	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতার নাম জীবন সর্বস্ব কথাশিল্প

অস্থির

বিশেষ চতুর্থ সংকলন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

লিখেছেন :

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সতীন্দ্রনাথ মৈত্র কৃষ্ণ ধর গৌতম দাশগুপ্ত কুমার চক্রবর্তী বাণীউৎপল মুখোপাধ্যায় শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় সামসুল হক বেলাল চৌধুরী অলোক রায় মদনমোহন বিশ্বাস মোহিত চট্টোপাধ্যায় অমিতাভ গুপ্ত সজল বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজিৎ সরকার শক্তি চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণা সেনগুপ্ত শামসের আনোয়ার শ্যামসুন্দর দত্ত মানস রায় চৌধুরী আশিষ সান্যাল অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় শিবানী সরকার শুভঙ্কর ঘোষ দেবাশীষ সান্যাল শিবশম্ভু পাল আনন্দ বাগচী স্বস্তি চট্টোপাধায় শংকর চট্টোপাধ্যায় গৌরাঙ্গ ভৌমিক কল্যাণ ভট্টাচার্য স্বপন দাস শংকর দে অর্পিতা রুদ্র তপন রায় মৃণাল দেব দ্রোণাচার্য ঘোষ অনিল আচার্য অমিতাভ দাশগুপ্ত অলোক সিংহ রবীন্দ্র গুহ অভ্র ঘোষ মৃণাল হালদার চন্দন ভট্টাচার্য উৎপলেন্দু চক্রবর্তী দীপক সান্যাল পার্থ রাহা বীরেন্দ্র দত্ত

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্তর

কবিতা পত্রিকা

বিশেষ চতুর্থ সংকলন

পৌষ '৭৩

এই সংকলনের সংগেই অন্তরের পথপরিক্রমার প্রথম বর্ষের সার্থক সমাপ্তি। বিগত বছরের অভিজ্ঞতায় অন্তর একই সংগে পেয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরণা এবং বিরুদ্ধ সমালোচনা। এরজন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকেই অভিনন্দন জানাচ্ছি। * * * লিটল্ ম্যাগাজিনের পক্ষে কতকগুলি অপ্রতিরোধ্য বাধার সন্মুখীন হয়ে অন্তরের বর্তমান সংকলনের প্রকাশ বিলম্বিত হওয়ার জন্য আমরা অন্তরের শুভানুধ্যায়ী ও সচেতন পাঠকসমাজের কাছে অনুতপ্ত। * * * অন্তরের লক্ষ্য— সুস্থ কবিতা চর্চা, কবিতা পাঠের প্রসার এবং কবি ও পাঠকের সম্পর্কের মধ্যে গভীর নৈকট্য সৃষ্টি; এরজন্য অন্তর তার চলার পথে সকলের সহযোগিতা কামনা করছে।

সম্পাদনা

শ্যামসুন্দর দত্ত

শুভঙ্কর ঘোষ

Phone: 44-6552

FOR DISPLAY AND RENOVATION

Contact:

ASTER ADVERTISING

3, CAMAC STREET,

CALCUTTA.

With Compliments from—

CHAMPION NEON SIGNS

16, British Indian Street,
Calcutta-1.

উৎসবের দিনে চলুন বেড়িয়ে আসি

অজন্তা

হাওয়াই চপ্পল

বণিক রবার ইণ্ডাষ্ট্রীজ

আমাদের সহযোগী:

ইষ্টার্ণ রবার ওয়ার্কস

৭/এ, বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

With Best Compliments from

M/s C. NARAYAN & CO,

Stockists Of: IRON CLAD SWITCHES &, SPAIR PARTS

Dealers In: ELECTIRICAL GOODS

49, Ezra Street Calcutta—1

ভারতের বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্র হইতে সদ্য আমদানি কৃত
প্রসিদ্ধ ব্লাউজ, সায়া, বডিজ ইত্যাদির প্রচুর সমাবেশ

কা লী ব স্ত্রা ল য়

গভর্ণমেণ্ট ষ্টল নং ২৮।২৯ প্রোঃ
আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬ শ্রীস্বপন কুমার দাস
(ছায়া সিনেমার বিপরীতে)

আপনার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য

মা ষ্টা র টে লা র

ডি, বর্মণ

৮২।৪ই, বিধান সরণী, কোলকাতা-৪
(মিত্রা সিনেমার পাশে)

'ত্রিশঙ্কু' প্রণীত

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত

ইতিমধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়। বি. এ. অনার্স ও ঐচ্ছিক বাংলার ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। আজই কিনুন।

প্রাপ্তিস্থান: দে বুক ষ্টোর, তেরো, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২
প্রফুল্ল লাইব্রেরী, একাত্তর, বিধান সরণী কলকাতা-৬

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতার স্বপ্নগুলি

এখন রাত গভীর হ'লে তারা
নতজানু, জীবন ভিক্ষা করে।

তাদের হলুদ চোখে দারুণ ভয়
নাচতে থাকে, বুকের মধ্যে নিষ্ঠুরতা
হাততালি দেয়।

এখন রাত গভীর হ'লে তারা
প্রলাপ বকে, বাতাস চায়।

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

বসন্তের পাখী।

একদিন উড়ে এল গোটা কয় বসন্তের পাখী
কোন এক শীতের রাজত্বে
দেখল তারা
আদিগন্ত নিরুৎসুক মাটি
ধূলোয় ডুবিয়ে মুখ
একান্তে নিশ্চিন্ত পড়ে আছে

তারা ফিরে গেল

বহুদিন পরে ওরা এল
সে দিন আকাশ ভরা আলোর উৎসব
দেখল ওরা
একদল ক্লান্ত ম্লান মানুষের দেহ
মাথা নিচু করে পথ হাঁটে

ওরা ফিরে গেল।

কৃষ্ণ ধর

হৃদয়ের সংগে যুদ্ধ

হৃদয়ের সংগে যুদ্ধ প্রতিদিন রক্তাক্ত প্রহর
গুণে গুণে ভয়ংকর অতলে হারাই।
জন্মাবধি অন্বেষণ সুখ শান্তি এবং কিছুই না
আজ তবু নিজস্ব প্রতিবিম্বকে ডরাই॥

সময়ের ভেলা চড়তে মন্দ লাগেনা তো
তারই চুল মুঠি ধরে ভাসি
কখনো উন্মত্ত চেউয়ে ডুবন্ত কণ্ঠের আর্তনাদ
সৈকতে গড়ায় যত ভালবাসাবাসি॥

নিঃশব্দ সংহার নয়, উচ্চকিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ ভালো
অন্ধকারে কেন মাগো তারচেয়ে বাঞ্ছিত আলোক
কে যেন শৈশবে ডাকে, নিষ্পাপ আকুলে
দিনগুলি ধরা ছিল, রূপকথা মোড়া যত শ্লোক॥

হৃদয়ে চাইনা যুদ্ধ, প্রতিদিন অস্তিত্বের দায়
কে মেটাবে, নিজে ভাবি আমি আগন্তুক।
মাঝখান থেকে শুধু রক্ত ঝরলো নিঃশব্দ আঘাতে
অন্ধকারে তবু দেখি তোমার সে মুখ॥

গৌতম দাশগুপ্ত

সতর্কের এই বেলা

কাঠবিড়ালীর মত অকারণ খেলা
হৃদয়-ভিখারী, মোহভিখারীর দল তোর চারপাশে
প্রেমাভিমানিনী সতর্কের এই বেলা
ফড়িং-এর মত ঘর বেঁধে ফ্যাল
ঘন নেপিয়ার ঘাসে।

কুমার চক্রবর্তী

সাঁকো পেরোলে

সহসা স্বপ্নের ঘোরে দেখা হ'লো তোমায় শরীরী
নীল আকাশের নীচে গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলে
তোমার এলোমেলো চুল, শাড়ী, ওষ্ঠেজড়ানো কালো কালো হাওয়াগুলি
আমাকে বিঁধছিল
প্রথম বৃষ্টির মতো
তোমার চোখের আলো জোৎস্না-ম্লান, যেন কৈশোরের উচ্ছ্বলতা
একী, এত বছর পরেও তোমার বিন্দুমাত্র বদল নেই
সেই ঘ্রাণ, নিঃশ্বাস, প্রগাঢ় চুম্বন—সমস্ত একাকার
কতক্ষণ মনে নেই—
স্বপ্নের সূর্য ক্রমে ডুবে যাচ্ছিল
তোমার হাতের সাদা মাস্তুলটাও
খুব ছুটছিলাম তোমায় বাঁচাতে—
এখন আমার হাতের মুঠোয় কিছু ঘাম....
এখন একটা টিকটিকি আমার চোখে চোখ রেখে সোজা তাকিয়ে আছে।

কবিরাই 'টাচি' আর বিধবা যুবতী

মোটের ওপর আমি আহত তবু বরফ ভাঙ্গছি। মোটের ওপর আমি আহত তবু হামাগুঁড়ি দিয়ে হাঁটছি। না মশাই, হামাগুড়ি নয়. কন্যাদায়গ্রস্ত কুঁজোর মতোন। অথচ দেখুন, আদতে আমার বিয়েই হয়নি। হবে বলে মনে তো হয় না। আঃ বলছিনা আপনার বউ মারা যাবে না ধরেই নিন না আমি আহত, তবু হামাগুঁড়ি দিয়ে হাঁটছি যেমন বাউণ্ডলে প্রেমিকের মাশুল যোগাতে গিয়ে মুখে রক্ত উগরিয়ে হাঁপায় গাভিন চিল। আপনার মরা বাপ ঠাকুর্দার জয় হোক, যথার্থ বলেছেন মশাই, মোটের ওপর আমার ভূমিকা শহরে নবাগত দেশোয়ালীর মতোন।

অনেক তরুণীর লাস নিয়ে খেলা করলুম কিন্তু কি ভাগ্য দেখেছেন, জীবন-সঙ্গিনী বলতে কাউকেই পেলাম না। এতগুলো এ্যাক্সিডেণ্ড অর্থাৎ কাব্যি

করলে কিনা ব্যর্থ প্রেম! ছিঃ মশাই কাঁদছেন কেন, আহত বাঘ দেখে কেউ কাঁদে নাকি! ভুলটা ভেঙ্গে দিলেন তো, এতদিন জানতাম কবিরাই টাঁচি আর বিধবা যুবতী!

বাণী উৎপল মুখোপাধ্যায়

ভিলানেল

মগ্ন বকুলের সুরভি ছবি আঁকে
হৃদয়জুড়ে বাজে সুপুরে চেনা গান
স্মৃতির ধূলি ওড়ে পথের প্রিয় বাঁকে

শাওন-উদরের মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
চৌয়ান রোদটুকু সেতারে সাধা তান
সিক্ত কালোচুলে সূর্য্য দর হাঁকে

দিবস-রজনীর নাড়ীর পাকে পাকে
না-ভোলা বেহালার ছড়ের শেষ টান
স্মৃতির ধূলি ওড়ে পথের প্রিয় বাঁকে

চৈত্র-পরবাসে বকুলে পথ ঢাকে
শ্রাবণ ফিরি করে পুরনো চেনা গান
সিক্ত কালো চুলে সূর্য্য দর হাঁকে

বনের পথে পথে কে যেন পিছু ডাকে
হারানো দিন কিছু পুরানো অভিমান
স্মৃতির ধূলি ওড়ে পথের প্রিয় বাঁকে

চৈত্র-পরবাসে বকুলে পথ ঢাকে
হারানো দিন কিছু পুরানো অভিমান
সিক্ত কালো চুলে সূর্য্য দর হাঁকে
স্মৃতির ধূলি ওড়ে পথের প্রিয় বাঁকে।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

পদতলে অন্ধকার

তুমি কী গোপন করতে চাইছ, শুনি?
লুকোনো সম্পদ কিছু আছে?

নেই। সব স্বচ্ছ হয়ে গেছে বহুক্ষণ—
দুটি চোখ পদতলে অন্ধকার রেখে জ্বলতে চায়,
দুপাশে নদীর মতো রেখা এঁকে জাগ্রত নাসিকা
দেখায় গহ্বর।

যতই উজ্জ্বল দামী পরিচ্ছদ দিয়ে লজ্জা ঢাকো
রহস্যের অধ্যাস ওড়ে না:
স্তনের উপরে স্তন জেগে ওঠে উদরের মতো…
উদরের কাছে আরোহণ…
বহু-পরিচিত দ্বিধা—অসম্মত ইচ্ছুক ভিখারী।
কোথায় আড়াল খুঁজছ?
—অসুখ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিগত অর্জন রাখার
জায়গা নেই;
শরীর গন্ধের শিশি—মুখ খুললে ওষুধের সুঘ্রাণ ছড়ায়!

বরং বেঢপ ওই দেহটাকে সামনে তুলে ধরো,
রূপ দেখি—
বিবাহিত বন্ধুরা যেমন
বেদনায় দেখে প্রতিদিন;
বরং নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও সটান,
নির্জনতা দেখি

নিজের পায়ুর পরে ভর দিয়ে বোসো…
গোপন রাখার মতো কিছু নেই, সব দৃশ্যমান:
দুটি চোখ—অন্ধকার, নদীর মতন রেখা, জাগ্রত নাসিকা
স্তনের উপরে স্তন—স্নেহহীন,
আরোহণ—দ্বিধা
উদরের ভিতর রেশম……

এই সব দেখি, দেখে তপ্ত হই—উচ্চকিত হই
যতখানি তপ্ত হলে সুপুরুষ কেটলিদের উষ্ণীষ লাফায়।

সামসুল হক

না-সর্বনাশ, না-সফলতা

প্রকৃত সমুদ্র কোন নিয়তির মধ্যে প্রবাহিত ?
বোধের জাহাজে দীর্ঘ নিশ্চিত মাস্তুল
গলায় ঝুলিয়ে চাঁদ সব সর্বনাশ পার হয়—
কোথায় সমুদ্র, বোধিজাহাজ, মাস্তুল ?

তবে অনর্থক কেন প্রবেশ প্রস্থান ?
অনর্থক জরায়ু ও শ্মশানের গান।
সর্বনাশ পার হ'লে সফলতা পার হ'তে হয়,
ফিরে চলো, এখানে এ-বাড়ী আর নয়।

তবু শব্দ থেকে যায়, তবু স্মৃতি, অর্থনীতি থাকে,
তর্ক ও কবিতা একসঙ্গে থেকে যায়,
কেন যে জাহাজ চাওয়া, কেন যে সমুদ্র খোঁজা, আর,
কেন রাতে মনে হয় সারাদেহে ঘিরে আছে পাপ !

গলায় ঝুলিয়ে চাঁদ সর্বনাশ পার হওয়া যায় না কখনো,
সর্বনাশ পার হ'য়ে সফলতা পাওয়া যায় নাকি ?

বেলাল চৌধুরী

লাল নীল রুপালি নীরব

সারাদিন শুয়ে আছি নির্ভার দেহমন
কড়িকাঠ গুনছি বারবার কতবার
শাদা চূর্ণ বালি পলেস্তরা খসে পড়ে
ধুলোবালি ওড়ে শীতের উড়ুউড়ু হাওয়ায়
কানামাছি খেলিবার সাধ হয় শুয়ে শুয়ে
মুখোমুখি হবার যদি কেউ থাকিত এখন
ফিসফিস অস্ফুট কথা বলিবার মুখে মুখ
বুকে মুখ সুড়সুড়ি সুখ খিলখিল হাসিবার

অলোক রায়

আধুনিক কবিতা : প্রেরণার অর্থ

প্রথম বলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৩৭ এ, বিষ্ণু দে'র 'চোরাবালি' প্রসঙ্গে, 'বিষ্ণু দে'র মতো এলিয়ট-ভক্ত কথনও নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না।' পরে ১৯৫৩ এ 'সংবর্ত'-এর মুখবন্ধে নিজের কবিতা সম্বন্ধেও মন্তব্য করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ 'প্রেরণা-নামক দায়িত্বহীনতার মর্যাদা লাঘব অবশ্যম্ভাবী' বিবেচনা করেছেন, এবং 'অর্কেষ্ট্রা'র ভূমিকায় আরও স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন, 'প্রেরণাতে অলৌকিকের আভাস আছে বলে, সাহিত্যসৃষ্টির উক্ত উপকরণ আমি সাধ্য পক্ষে মানতে চাইনি, তার বদলে আঁকড়ে ধরেছিলুম অভিজ্ঞতাকে।' তিরিশের দশকে বাংলা কবিতার গতি-পরিবর্তনের সময়েই এ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রোমান্টিক কবিতার প্রতিক্রিয়ায় নূতন কাব্যধারার সূচনা হচ্ছে। কবিতাকে 'অলৌকিক' বিবেচনা অবশ্য রোমান্টিকদের স্বভাব ধর্ম হলেও, প্রাচীনতর ঐতিহ্যস্বীকৃতও বটে। রবীন্দ্রনাথ নিত্য অনুভব করেছেন 'অলৌকিক আনন্দের ভার / বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার, / তার নিত্যজাগরণ।' এই 'অলৌকিক আনন্দের ভার' নিশ্চয়ই সৃষ্টি-প্রেরণা। কবিতার মধ্যে, বিশেষতঃ ছন্দের মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে আছে, তার ব্যাখ্যা বুদ্ধিগম্য নয়। ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই কবিতার সঙ্গে দৈবী বিশ্বাস যুক্ত হয়ে আছে, এবং কবিত্ব শক্তি দেবতার আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ, এ সত্য ধ্রুপদী যুগেও স্বীকৃতি পেতে দেখি। আর প্লেটোর অনুগত ভক্তেরাও, অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে গুরুর বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হয়েছেন, সিড্‌নি বা শেলী উত্তেজিত হয়েছেন প্লেটোর কাব্যবিরোধিতায়। অথচ প্লেটো কাব্য সৃষ্টিতে প্রেরণার ভূমিকা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা বিশেষ ভাবেই রোমান্টিক কাব্য সম্বন্ধে সুপ্রযোজ্য, আসলে প্রেরণা যুক্তির শৃঙ্খল মানে না, কবি কাব্য রচনাকালে লৌকিক জগতে অবস্থান করেন না, একটা উন্মত্ত আত্মহারা আবেশ কবিতার জন্ম দেয়। প্লেটো এই

নিয়মশৃঙ্খলামুক্ত আত্মবিস্মৃতিকে কাব্য রচনার পক্ষে অনিবার্য বিবেচনা করেছেন, কিন্তু সেইজন্যই কবিকে তিনি তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে স্থান দিতে প্রস্তুত হননি।

প্রেরণার মধ্যে আবেগের স্পন্দন আছে। আবেগকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, একথা রোমান্টিক কবিরা জানতেন। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য প্রসঙ্গে বারবার সংযমবোধের কথা বলেছেন। কিন্তু প্রেরণাকে যদি স্বীকার করি, তাহলে কি তাকে সংযত করা সম্ভব, এবং কতখানি সম্ভব। এলিঅটের একদা মনে হয়েছিল শেলীর অসংযমবোধেই তাঁরই সর্বাঙ্গীন ব্যর্থতার কারণ। অন্যদিকে বোদলের যখন বললেন, 'মাতাল হও, যদি না মহাকালের পায়ে উৎসর্জিত দাস হতে চাও, মাতাল হও অবিশ্রাম।' অথবা র‍্যাঁবোর কাব্যের নাম যখন 'মাতাল তরণী,' তখন কি একথা মনে হয় না, মত্ততার আবেশ আধুনিক কবিও অস্বীকার করতে পারেননি। তবু পার্থক্য আছে, এবং প্রেরণা প্রসঙ্গে এই পার্থক্য সূত্রটি বুঝে নিতে পারলেই আধুনিক কবিতা অনেক খানি বোঝা যাবে।

প্রেরণার জন্ম হৃদয়ে। আধুনিক কবি বিশেষ ভাবে বুদ্ধিজীবী। মননের নিকষে অভিজ্ঞতার সত্যতা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন বর্তমান শতাব্দীর কবিরা। এর ফলে নৈয়ায়িক নৈরাত্মসিদ্ধি আর অসম্ভব থাকে নি। ১৯১৭ তে এলিঅটের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর এজরা পাউণ্ড তাঁর আলোচনায় আবেগের অভাব সম্পর্কিত বহুশ্রুত অভিযোগটির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু 'আবেগ' শব্দটি আধুনিক কবিতায় স্বতন্ত্র তাৎপর্য লাভ করেছে, সে ইঙ্গিত পাউণ্ডের অন্য প্রবন্ধে দেখেছি। আবেগকে অস্বীকার করা হয় না, আবেগ প্রকাশের রীতি ও বাহন শুধু পরিবর্তিত হয়েছে। অবশ্য 'শুধু পরিবর্তিত' কথাটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে বলা ভালো। ভালেরি তো অনেকদিন আগেই বলেছিলেন, 'যদি আমাকে লিখতে হয়, তাহলে ভাবাবিষ্ট অনুপ্রেরিত অবস্থায় মহান্ কাব্য লেখা অপেক্ষা পরিপূর্ণ সচেতনায় এবং সম্পূর্ণ সরলবোধ্যতায় দুর্বল কবিতাই বরং লিখব।' (এরিক্ হেলার উদ্ধৃত, দি ডিসইনহেরিটেড মাইণ্ড, পৃঃ ২৩৯)। এখানে আবার সেই আত্মসচেতনার প্রসঙ্গ আসছে। অবশ্যই হোল্ডারলীন বা রিল্‌কের কবিতাকে ঠিক এই অর্থে আত্মসচেতন কবি-কর্ম বলা যায় না, বিশেষতঃ হোল্ডারলীন যখন বুদ্ধির অগম্য 'আলোকিত স্বচ্ছ দর্শনে' বিশ্বাস করেন, তখন প্রেরণার সীমারেখাটি বোঝা যায়। আসলে 'প্রেরণা'-শব্দটির আদি অর্থ ছিল প্রত্যাদেশ বা ভাবাবেশ। আধুনিক কালে প্রেরণা শব্দটিকে ভাবাবেশ অর্থে গ্রহণ করতেই কবিদের আপত্তি। রোমান্টিক কবিরা কাব্যসৃষ্টিকে আকস্মিক ভাবাবেশ এবং চৈতন্যের জাগরণ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। আধুনিক কবিতা আকস্মিক ভাবাবেশের সৃষ্টি নয়, তার প্রস্তুতি অনেকখানি, এদিক থেকে ধ্রুপদী কবিতার সঙ্গে আধুনিক কবিতার পরোক্ষ একটা যোগ আছে। এলিঅটের 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' বা সুধীন্দ্রনাথের 'উটপাখী' কবিতার পশ্চাতে আকস্মিকতার অবকাশ সামান্যই, সেখানে কবির সমাজচেতনা এবং জীবনজিজ্ঞাসা বুদ্ধিপরিশীলিত সচেতনার জগৎ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কাব্যের জগতে পৌঁছেছে! সুতরাং বুদ্ধদেব বসু যখন বিষ্ণু দে'র কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন, অন্তঃপ্রেরণার তাড়নায় কবিতা না লিখলে কিসের তাড়নায় কবি কবিতা লেখেন, তখন বোঝা যায় রোমান্টিক কাব্যসংস্কার প্রেরণা শব্দটিকে কোনো কোনো আধুনিক কবির মনেও কি রকম বদ্ধমূল ভাবানুষঙ্গ দিয়েছে। বুদ্ধদেব বসু সম্ভবতঃ প্রেরণা শব্দটি প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা রূপেই গ্রহণ করেছেন, এবং প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা সব কবির মধ্যেই আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' বা 'বলাকা' কবিতা, এমনকি 'শেষ লেখা' কাব্য গ্রন্থের যে কোনো কবিতাতেই যে অ-লৌকিকের আভাস পাওয়া যায়, বিষ্ণু দে'র 'ঘোড়সওয়ার' বা 'পাঁচপ্রহর' কবিতায় তা পাওয়া যাবে না। (অবশ্য যদিনা কবিতার ভাষা-ছন্দের মধ্যে অলৌকিকের সন্ধান খুঁজি)। আধুনিক কবিতায় তাই শুনি,

উৎস লুপ্ত। তারা খসে পড়া। সুরেশ আকাশ খোঁজে।
লক্ষ্য লুপ্ত। রৌদ্রে বৃষ্টি মাটি খোঁজে নবজন্মে।
শিশিরে ধোঁয়ায় শুকিয়েছে তার কোমল লিলির শরৎ।
বেকার সুরেশ ফাল্গুন খোঁজে ভিড় ঠেলে রাস্তায়
শহরে গলিতে ফাল্গুন খোঁজে—জীবন আবীরগুলাল্।
(বিষ্ণু দে : দিনগুলি রাতগুলি)

এ কবিতাকে যদি দুর্বোধ্য মনে হয়, তার জবাব আছে। আধুনিক কবিতায় দুর্বোধ্যতার প্রসঙ্গটি পরে আলোচনা সূত্রে আসবে। আপাতত মেনে নিতে

হবে, আধুনিক কবিতা অভিজ্ঞতানির্ভর এবং বুদ্ধির চাবি কাঠি ছাড়া সে কাব্য জগতে প্রবেশাধিকার মিলবে না।

কিন্তু তার মানে কি কবিতা একান্তই বুদ্ধিমানের চতুর প্রগল্‌ভোক্তি? নিশ্চয়ই নয়। কবিতা পরাসত্যেরও সংবাদ দেয়, এবং 'ফোর কোয়ার্টেট' কবির নিছক ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকাশ নয়, আধুনিক কবিতার দৃষ্টান্তও বটে। র‍্যাঁবো কবিকে বললেন দ্রষ্টা, কবির দৃষ্টি কেবল অন্তর্ভেদী নয়, দেশকালের ব্যবধান ভেদেও সক্ষম। একদা আধুনিক শিল্পীরা চেয়েছিলেন চেতনার অগম প্রদেশকে দৃষ্টি গোচর করতে। অবশ্যই সহজ ছিলনা সত্যতর সেই অবচেতনার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির কথাও এখানে বিশেষ করে মনে পড়বে, যেখানে মগ্নচৈতন্যের প্রকাশ, যেখানে বিচিত্র প্রাগৈতিহাসিক জীব কালো ও লালের জগতের বাস করে। শিল্পীরা প্রথম যখন উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার করতে সুরু করেছিলেন, তখন আপত্তি উঠেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আপত্তিকর হলুদ-লাল-কালো রঙ্‌ ব্যবহার করা হয়েছিল সেই একই কারণে, শিল্পীরা হতে চেয়েছিলেন দ্রষ্টা। ভ্যান্‌ গগ্‌ পাগল হয়ে গেলেন, কারণ তিনি ছিলেন দ্রষ্টা, তিনি দেখতে চেয়েছিলেন এই ধূসর অপরিচ্ছন্ন জগতের অন্তরালে বর্ণাঢ্য হলুদের জগৎ। অথচ সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে ভ্যান্‌ গগের অধ্যবসায় ও পরিশ্রম প্রবাদতুল্য। অন্যদিকে মনে রাখতে হবে, তাঁরই পাশে রয়েছেন স্যুরাত এবং সিগনাকের মত শিল্পীর বিজ্ঞানী সুলভ বর্ণপরীক্ষা। এখানে আবেগ এবং নিরাবেগের স্থূল প্রভেদ নির্ণয় অসম্ভব। আসল কথা, আকস্মিকতা এবং স্বভাবধর্মিতাকে অস্বীকার, এবং তখনই প্রয়াস প্রযত্নের প্রশ্ন আসে। আধুনিক চিত্র বা কবিতা এই দিক দিয়ে এক বিপরীত প্রবণতাকে আত্মস্থ করেছে।

একদিকে চেতনালোকের অন্ধকারকে আলোকিত করা, অন্যদিকে আত্মনিরপেক্ষ মননচর্চা। একদিকে বিসংগতিকে আবিষ্কার, অন্যদিকে সংগতি রচনার চেষ্টা। বোদলের যিনি মাতাল হওয়ার বিধান দিলেন, তিনি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লৌকিক অর্থে কোনো মত্ততার পরিচয় রাখেননি তাঁর কবিতায়, অন্যদিকে এলিঅট যিনি প্রেরণাকে অস্বীকার করতে চাইলেন, তাঁর কবিতাকেই ধর্ম বিশ্বাস-প্রেরিত কবিতা বলে অনেকে বিশ্বাস করলেন।

সুধীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতার কথা বললেন। এই অভিজ্ঞতার স্বরূপলক্ষণ কি? অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আধুনিক কবি দ্বান্দ্বিক প্রকরণকেই প্রকাশ করেন। সামাজিক বটে, কিন্তু সাময়িক নয়। ব্যক্তিগত বটে, কিন্তু আত্মকৈবনিক নয়। উপন্যাস থেকেই দৃষ্টান্ত নিই, প্রুস্তের 'হারানো সময়ের অনুসন্ধানে'র (আ লা রেসার্শ দ্যু তঁ্য পের্দ্যু) যে কোনো একটি অনুচ্ছেদ গ্রহণ করছি,

আমার মনে পড়ে, খোলা মাঠের মধ্যে ট্রেনটা থেমেছে।
দূরে রাস্তার দিক্‌প্রান্তে একসারি গাছের ডালের মধ্য দিয়ে
সূর্যের আলোটা হেলে পড়ছে।
'গাছ', আমি ভেবেছি,
'আর কিছুই আমাকে তোমার বলার নেই,
আমার তুষার শীতল হৃদয় তোমার কোনো কথা শোনে না।
আমি নিসর্গ প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে থেকেও
কি আশ্চর্য নিস্পৃহ, ক্লান্ত; আমি দেখছি
গাছের ডালের সঙ্গে সবুজ পাতা যেখানে মিলেছে
যদি কখনো ভেবে থাকি নিজেকে কবি
আমি তা নই, আজ আমি জানি।'
কিছু পরেই দেখেছি সেই একই নিরাসক্তি নিয়ে
সোনালী কমলা আলোর রঙে সেই ডুবন্ত সূর্য
গিয়ে পড়েছে এক বাড়ীর জানালার উপরে
বাড়ীটাকে আমার মনে হচ্ছে গোলাপীরঙের কিছু দিয়ে তৈরী।

এই সব কিছু আমি দেখেছি সেই পরম উদাসীনতার সঙ্গে
যেন বাগানে একটি মেয়ের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে
চোখে পড়েছে এক টুকরো কাঁচ এবং কিছু দূরে চুনের মত সাদা কিছু
সেই অপরিচিত রঙের স্পর্শেও দূর হয় না আমার সর্বগ্রাসী ক্লান্তি,
এবং নিছক সৌজন্যবশত মেয়েটিকে কিছু বলেছি, ঐ রঙ্‌
আমি দেখেছি আর দেখিয়েছি মেয়েটিকে রঙীন কাঁচের টুকরো,
চুনের স্তূপ, সেই একই উপায়ে এবং

নিজেকে বিবেক মুক্ত রাখার জন্য
দেখিয়েছি সব কিছু, যেন একজন
আমার পাশে আছে, যে আমার থেকেও অনেক বেশী আনন্দ পাচ্ছে
এই সব কিছু থেকে, জানালায় যেন প্রতিফলিত আগুনের শিখা
আর গোলাপী স্বচ্ছতা বাড়ীর।
কিন্তু আমায় সেই সঙ্গীটি যাকে দেখাচ্ছি বিচিত্র দৃশ্য,
নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যমুগ্ধ অনেকের থেকে তার আগ্রহ কম
কারণ সে দেখেছে এই নানা রঙ
কিছুমাত্র আনন্দ প্রকাশ না করে।

প্রায় আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করেছি, শুধু চরণ বিন্যাস আমার, কিন্তু একে কবিতা বলতে বাধা কি? ফ্রস্ট্ যে অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছেন, তার নির্বিশেষত্বই এই অংশটিকে কাব্যধর্ম দিয়েছে, এবং সম্ভবত আধুনিক উপন্যাসের সঙ্গে কবিতার বিচ্ছেদ রেখা এই কারণেই ক্রমে মিলিয়ে আসছে। নাটকের সঙ্গে কবিতার নৈকট্য ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তারও কি কারণ এই নয়? আধুনিক কবিতার নাট্যলক্ষণ সর্ববাদী সম্মত, এবং সম্প্রতিকালে কাব্যনাট্য রচনায় আগ্রহ নিতান্ত আকস্মিক নয়। সুতরাং প্রেরণা আর নিতান্ত অ-লৌকিক দৈবী মহিমায় বুদ্ধির অগমলোকে অবস্থান করে না, এমনকি অন্তঃপ্রেরণাও আকস্মিক নয়,—প্রস্তুতি আছে, প্রেরণার সামাজিক ও ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা এখন সম্ভব। আধুনিক কবিতা তাই 'স্বভাব কবি'র রচনা নয়, বিচিত্র প্রভাবে গঠিত কবি ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

মদনমোহন বিশ্বাস

পশ্চাতে

প্রতিবার আমি যেন
ঘন অরণ্যানীর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি
পার হতে ভেবেছি
অরণ্যানীর ঠিক পশ্চাতে
এক বিশাল সমুদ্র অপেক্ষায় আছে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

বনস্থলী

বনস্থলী,
বনস্থলী!
মৃত্তিকাতে গৃহস্থালী
বুকের মধ্যে রুক্ষ মাটি
বৃক্ষহীন কোথায় হাঁটি?
বনস্থলী,
বনস্থলী!
ফুলের ফুলকে দেখি
ঘুমের মধ্যে ঘুম থাকেকি?
হৃদয় জুড়ে বাতাস এলে
কোথায় চলি?
বনস্থলী,
বনস্থলী!

অমিতাভ গুপ্ত

ঈর্ষা

বিড়ালের কাছে
অন্ধকার পরাজিত, বিড়াল পেয়েছে খুঁজে যা কিছু শাশ্বত,
বিড়ালের বুকের মধ্যে বাসা বাঁধে না উই

ফেলে-দেওয়া পুরোনো জয়েরীর মতো, জলে-ডুবানো
নুনের মত,
ভুল-ট্রেনে-ওঠা-দূরপাল্লার-যাত্রীর মতো,
আমি
বিড়ালকে ভীষণ ঈর্ষা করি

যেহেতু বিড়ালের প্রচ্ছন্ন প্রতিভা আমিও প্রার্থনা করি
আসলে কবিতা লেখার কোনো সার্থকতা নেই
যতক্ষণ না পাওয়া যায় সার্চলাইটের মতো দীপ্ত দুই চোখ:

সজল বন্দোপাধ্যায়

তিনি বলেন

যেহেতু
রিক্ত ছলে অশ্রুপাত
যেহেতু
ভিক্ষার ঝুলি
ভ্রাম্যমান
নৈঃশব্দ্যে হৃদয়
জ্বলে ওঠে
সংগীতের অন্তিম সপ্তক
দূরে আরো দূরে
মেঘ পাখি মৃগ

তিনি
বলেন
ত্যাগ বীতস্পৃহা
বরং ভিক্ষার ঝুলি
ভ্রাম্যমান
নৈঃশব্দ্যে হৃদয়
সমস্ত অর্গল
মুক্ত বেণীর মত
আত্মার সমস্তগান বাতাসে বাতাসে
এবং সমস্ত যাত্রী নীলাভ মান্দাসে

অভিজিৎ সরকার

একমাত্র মাঙ্গলিক শব্দ 'আঙুর আঙুর'

'আঙুর, আঙুর চা-আ-ঈ—আঙু-উ-র'
চা'র হয়ে গেল সারা গলি
সন্ধ্যা দেয় ঝাঁপি খুলে সন্দেহের কড়ি
'সেবাদাসী, সেবাদাসী মন্দিরে কি আছো?' বিদূষক ডেকে ওঠে হাওয়া।

এখনই আঁচতে পারো রাত্রি কেমন হবে
কেমন চালিয়ে দেবে কড়িগুলো বিকল্প প্রথায়
প্রভাতের যকৃতে যন্ত্রণা পচতে থাকবে, ফুসফুসে রনিত হবে 'আঙুর আঙুর'
—এ কথাও এঁচে নাও।

অতএব এ গলিতে যত শব্দ চা'র হয়
একমাত্র 'আঙুর' শব্দ মাঙ্গলিক
একমাত্র 'আঙুর' শব্দ গলি ভেঙে বড় রাস্তায়
বড় রাস্তা থেকে স্তব্ধ মাঠ—নেশালু কুঞ্জলতা, অবশেষে দ্রাক্ষাবনে
তারপর চক্রবৎ গলির দেয়ালে, লিঙ্গে ফিরে আসে।

সে সন্ধ্যারা বড় পুণ্যবতী
কারণ তাদের ব্রতে 'আঙুর, আঙুর চা-আ-ঈ——আঙু—উ—র'
ডাকখানি চা'র হয়ে যায়
সে রাত্রি ভোমরা হয় অবৈধ উৎসবে, আঙুরের রসে মাখামাখি
আবার, পুণ্যবান প্রভাতের দৌলতে
ফের সন্ধ্যাদের 'মা' বলে ডাকে—
বড় পুণ্যবতী তাই সন্ধ্যারা (জেনে রাখো)
রাত্রির ডাগর চোখ, অভিমান ছলা সঞ্জীবনী (জেনে রাখো)
এবং অনুব্রতী প্রভাত-সবাই সুস্থ, স্বাভাবিক এবং বিনয়ী (জেনে রাখো)।
অতএব 'আঙুর, আঙুর' শব্দ একমাত্র মাঙ্গলিক এ গলিতে
এই পৃথিবীতে

'আঙুর আঙুর' শব্দ বড় বেশী স্পন্দমান প্রত্যেক স্নায়ুতে
'আঙুর আঙুর' শব্দ রক্তের রজনীগন্ধার স্ফুট কলি যেন!

একমাত্র এই শব্দ মাঙ্গলিক শব্দের গীর্জায়
একমাত্র এই শব্দ ধার্মিক, লম্পট, সেবাদাসী, সতী, উপযাজক
যে কোনো কাউকে টেনে নিতে পারে ব্রহ্মে
যে কোনো কাউকে টেনে নিতে পারে চৌ-মাথায়
তারপর বড় রাস্তা ধরে অলিগলি
এবং গলির টানে গলির গলিতে—অন্ধ গলিতে সঁপে দেয়।
সকালেই এই গলি দ্রাক্ষাবনে মিশে যায় এবং প্রত্যেকেই
প্রকারান্তরে দ্রাক্ষা-উৎপাদক, শ্রমিক, মজুতদার অথবা মূলধনী
সন্ধ্যাতে আকারন্তরে ধার্মিক, লম্পট, সেবাদাসী, সতী ইত্যাদি।

তাই যদি বুকে ভর ক'রে সেই মাঙ্গলিক ডাকখানি
চা'র ক'রে দিতে পারো দ্রাক্ষাবনে. মাঠে, কুঞ্জে, বড় রাস্তায়
দেখবে, প্রত্যেক যুবক যুবতী (যে কোনো বয়সী) টেনে নেবে
তার আস্বাদ গলির দেয়াল চেটেপুটে

তার পরদিন থেকে তোমারো চতুর্দিকে 'আঙুর আঙুর' শব্দ
চলাচলি ক'রে যাবে
তুমিও মোক্ষবান এই গলিতে—এই পৃথিবীতে!

॥ ঘুম ॥

বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রেম
চুলের থেকে চিন্তাগুলো সরিয়ে নিলো হাত
রাতের শাড়ী সহজ হয়ে আসে
ক্লান্তি এসে জানলা ধরে থাক।

এবার আমি শান্ত নিথর হিমে
তলিয়ে যাই ঘুমে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার দৈর্ঘ্য ভালোবাসার

আমার দৈর্ঘ্য ভালোবাসার কয়েক মাইল লম্বা হবে
ঘোরানো পথ ছাড়িয়ে যদি চলতে পারি সারাজীবন
আমার দৈর্ঘ্য ভালোবাসার কয়েক মাইল লম্বা হবে।

আকাশ মেঘে অথৈ, আমি খুঁজে দেখছি বাড়ি তোমার
বনজঙ্গল ছাড়িয়ে পাচ্ছি লোকবসতির পায়ের চিহ্ন
বাঘ-শিকারী যেমন খোঁজে জলন্ত টর্চ, স্বচ্ছ বোমার—
আকাশ-মেঘে অথৈ, আমি খুঁজে দেখছি বাড়ি তোমার।

বাড়ি তোমার খুঁজছি নাকি? হয়তো তাকে এমনি পাবো
মেঘের গাদায় মুণ্ডু গোঁজা—চারদিকে দুর্গম পরিখা—
একা থাকার আবেষ্টনী তৈরি করে রাখলে যদি
একাই থাকতে পারা যেতো—তুমি কি আর অন্য ভাবো?

আমার দৈর্ঘ্য ভালোবাসার কয়েক মাইল লম্বা হবে

হলুদ সিংহ

হলুদ সিংহ দৌড়ে এসে লাফ দিলো নীল জলে
তুমি চলেছো সঙ্গে আমার সুন্দর জঙ্গলে
এপার-ওপার নিকট ও দূর, সব নিয়ে সিংহটা
জলে দিয়েছে সাঁতার—আমার তুচ্ছ হলোই ছোটা

তীরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, তীরের থেকে এসে
অন্ধ এ সুন্দর জঙ্গল কি সিংহে ভালবেসে?

কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

মোনালিসা

রোজ রাতে স্বৈরিণী স্বপ্ন স্থান নেয়
আমার এ জগতে।
আমি তো চাই সাদা আলোয় প্রধান
পবিত্র হয়ে থাকতে
অথচ আমি কেন রোজ রাতে নিয়মমত
একবার করে স্বৈরিণী স্বপ্নকে দেখি
আমার এ জগতে!
এই স্বপ্নের ঝাউবনে ডুবে যেতে যেতে
ভাবনাটা উন্মত্ত হয়ে ওঠে,
কেননা এই পর্বের পরই প্রতিদিন সকালবেলা
আমার আয়নাটা আমাকে
মোনালিসার হাসি
উপহার দেয়।
অথচ আমি এই ভরা বছর নিয়ে
প্রধান হয়েই থাকতে চাই।

অনেকগুলি স্বর্গ

(Fitzgerald কর্তৃক অনূদিত ওমর খৈয়ামের রুবাইত থেকে)

এখানে মরুভূমিতে এসে থেমে গেছে
স্বর্গের অমরাবতী।
বাতাসের গায়ে গায়ে লেগেছে
মৃদু অমৃতের ঢেউ।
তারই তালে তালে নেচে চলেছে
চারপাশের অগুণতি স্বর্গপরীরা।
কেননা আমি এসেছি এখানে।
হাতের তালুতে মাথা রেখে
শুয়েছি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে।
আমার প্রাণে জেগেছে
সুখস্বপ্নের আভাস দেওয়া জোয়ার
আমার দেহে এনেছে নোতুন উদ্যম
পাত্রের দ্রাক্ষা মদিরাটুকু।
কানে ভাসছে ললিত সুর প্রিয়ার কণ্ঠের,
সে আছে আমারই কাছে আমারই পাশে।
আমি এখন
ম রু ভূ মি তে
গান শুনতে শুনতে একটি কবিতার বই পড়ছি
আমার প্রিয় কবির কবিতা।

শামসের আনোয়ার

তুমি তো দুঃখ বোঝ না

তোমাকে ভালোবাসি না ভালোবাসি না কি করে
যে বোঝাই কেন যে বাসি না
তুমি তো দুঃখ বোঝ না
ঝর্ণার মত এমন তোমার হাসি প্রচুর
আলোর মতই স্বাস্থ্য
সারা জীবনব্যাপী তোমার শুধু পিকনিক
কেবল ভুলে থাকার খেলা
আমার সারা জীবন যেন ঝরারই আয়োজন
বিষাদ মধুর স্মৃতি
তোমাকে তাই ভালোবাসি না
ভালোবাসি না কি করে
যে বোঝাই কেন যে বাসি না
তুমি তো দুঃখ বোঝ না
আর ভালো যে বাসি না তাতে কিবা আসে যায়
তুমিই কি আর বাস
যদি বা বেসেও থাকো সে তো এবেলার পিকনিক
ও বেলায় আর এক পিনে জানি বাজবে রেকর্ড।

শ্যামসুন্দর দত্ত

পথ অন্তহীন তুমি সিগন্যাল

শূন্যতা ব্যতীত কিছুই আঁকড়ে ধরতে পারিনি কোনদিন
করতলে মেলেনা কোন সমর্পিত বাহু, তাই বলে ভেঙে পড়া কেন !
অকারণ বিমর্ষতা কেন ম্লান ক'রে দেবে চলার পথের দীর্ঘ ছবি,
সুদূরের স্বচ্ছতা উদার !
অন্তত তুমি তো আছো বুকের গভীরে, রক্ত চলাচলে, অন্তরালে
দু হাতের কাছে না পেলে সে কি পাওয়া নয় তবে !
সে কি শূন্যতা ব্যতীত কিছু নয় !

হাতের মুঠিতে আছে পথ, শুধু পথ, পথ ধরে চলে যাবো অবিরাম
পথ চলা জানা আছে খুব, পথ যে অন্তহীন
সংগীবিহীন বলে বৃথা মোচড় উঠবে কেন বুকের ভিতরে
একা পথে অত ভয় কেন ! অত অভিমান কার পরে !
তুমি তো আছো ঠিকই বুকের গভীরে, মর্মতলে, উজ্জ্বল স্মৃতিতে
স্পষ্ট মনে পড়ে সন্ধ্যাবেলায় সেই লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে
অন্ধকারে পরস্পর নিঃশব্দে চোখে চোখ রাখা
সারাদিনের অনুচ্চারিত কলরবের শেষে তোমার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস
স্তব্ধ ক'রে আনে আমার হৃদপিণ্ডের দোলা, সন্ধ্যাছায়া আরো
গাঢ় হয়

অন্ধকারে তুমি সিগন্যাল, আমি দুহাত বাড়িয়ে থাকি
তোমার দীর্ঘতম নৈঃশব্দ্যে আমি পায়ে পায়ে শুনতে পাই
বহুদূরে ভেসে যাওয়ার নিবিড় আহ্বান
কেন যে এমন করে আমায় পথে পথে ঘুরিয়ে ফেরাও শুধু !
পথের চলায় তো কোন থামা নেই, কথা নেই মুখোমুখি বসে
শুধু অন্ধকারে তুমি সিগন্যাল, তুমি আশ্চর্য আলোর রেখা,
হাতছানি, প্রত্যাখ্যান
আমার যে ওলোট পালোট হয়ে গেছে দূর ও নিকট সবকিছু
সংগীবিহীন পথে পাশে নেই কেউ, নেই করতলে সমর্পিত বাহু
তাই বলে কি মিথ্যে পথ চলা ! স্মৃতিও অলীক ! শুধু প্রতারণা
বুকেরও গভীরে মগ্নতায় ! বৃথা ভয়
অন্তহীন পথ ধরে চলে যাবো অবিরাম, অত ভেঙে পড়া কেন !
পথচলা জানা আছে খুব
ভিতরে ভিতরে তুমি জানি এইভাবেই
ছন্নছাড়া ক'রে আমায় চিরকাল ঠেলে দেবে নিরুদ্দেশ পথের দিকে শুধু।

কষ্ট

রাতেরও কোন কষ্ট নেই, রাতের আছে অনন্ত নক্ষত্রের বীথি
আবিল অরন্যেরও আছে নিভৃতে রূপালী হ্রদের স্বাদু জল
নিঃসংগ বৃক্ষেরও কোন কষ্ট নেই, প্রখর রোদ্দুরেও দীর্ঘতম ছায়া
তার পদতলে শান্ত পড়ে থাকে

অথচ কোথাও
দুয়ার খোলা ঘরেও ঢোকেনা নিবিড় হাওয়া
উদার করতলেও ঝরেনা ভোরের শুভ্র শিশির বিন্দু
অবিরল অশ্রুও পায়না প্রার্থিত হাত নির্ভরতার, সান্ত্বনা ঝরা
নম্র নয়ন

এমন কষ্ট কে জেনেছে ! এমন কষ্ট কারই বা আছে !

হৃদয় জুড়ে তৃষ্ণা কি আর সবার মেটে
সবাই কি আর বুকভরা ঘর বাঁধতে পারে
নিজের ভিতর উতল হলেও সবাই কি আর মুখ ফুটে সব
বলতে পারে ! চাইতে জানে !
সবারই পথ চাওয়াতে কি আর সমবেদনায় প্রত্যুত্তর
ব্যাকুল হয়ে ফেরে
যতই দুহাত বাড়িয়ে থাকুক, সংগোপনে কান্না পাথর
সাধের স্বজন তবু কি সবারই আসে !
এমন কষ্ট কে জেনেছে ! এমন কষ্ট কারই বা আছে !

সবাই কি আর সকল কষ্ট বোঝে !

মানস রায়চৌধুরী

গ্রন্থিমোচন

হেমন্তের অভিবাদন গ্রহণের দিন এসে গেছে
এস এইবার তাঁবু গুটিয়ে ফেলি
প্রতিটি খেজুরগাছে পুরোনো আয়নার মতো রৌদ্রের রহস্য
তোমার চোখ কি আজ কিছুই দেখে না
ভিতরে বাহিরে এমন কি ঘুমের কুয়াশা আলো করে
সর্বত্রই হেমন্তের অভিবাদনের দিন
যতো আছে গবাদি পশুর দল একে একে সব খুঁজে নাও
তাঁবুর প্রতিটি দড়ি প্রোথিত শিকড়গুলি তুলে নাও
দেখছ না কেন আমাদের জীবনের তিক্ত দৈনন্দিন এল
প্রথম রহস্য এই হেমন্তের দিন
আমার মুকুট কই যেতে হবে প্রতিটি শস্যের কাছে
শেষ রাজত্বের নিশান উড়িয়ে
দেখো স্থলে জলে এমন কি গৃহপালিতের
স্বাভাবিকতার মাঝে বিপুল হেমন্ত দিন অভিবাদনের বেলা
তোল তাঁবু তোল।

আশিস সান্যাল

ক্রমশ তোমার দিকে

ক্রমশ তোমার দিকে ফিরে যাই।
কী ভীষণ আকর্ষক প্রতিদিন তোমার প্রতিমা ;
জলের মতন স্নিগ্ধ অবয়ব,
বুকের মাধুরী
যেন দীর্ঘ অন্ধকারে উদ্ভাসিত দূরের নীলিমা—
যেন রৌদ্রে উন্মোচিত শফেদ রমণী,
নির্জনে ছড়াও হাওয়া বুকের দুপাশে—
যতোই নিকটে যাই সর্বত্র কাঙ্খিত
উজ্জ্বল, উজ্জ্বল বহে সুন্দরের হ্লাদিত বিশ্বাসে।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

প্রেমবাচক

রিক্‌শর ভিতরে পড়ল মোটরের মুখোমুখি আলো।
রিক্‌শর ভিতরে তারা যুবকযুবতী ছিল রিক্‌শর ভিতরে—
নগরীর ধ্বংসে দুলে, দুলে-দুলে, অলৌকিক ভাবে তবু তারা
পরস্পর স্পর্শের বাহিরে। স্পর্শের বাহিরে থাকা ভালো—
এইকথা ভেবে টেবে তবু তারা উত্তেজনা অনুভব করে
পরিশুদ্ধ ইচ্ছুক রুধিরে।.....
রিক্‌শর চাকায় বাজে রাস্তার ফোয়ারা।
হেডলাইট সরে যেতে, ক্ষণিক তড়িৎ হেনে চমকে গেল পিচ্ছিল ছলনা ;
আলো সরে যেতে শুধু অন্ধকার—অন্ধকার রিক্‌শর ভিতর
আণব প্রক্রিয়া ঘটে···হঠাৎ উপচে আসা, ট্রাফিকের লাল সিগনালে ;
হাতের মুখের লাল রক্তময় দাহগুলি টক্‌টকে লালের উপর
ঘুর-লেগে খেলা করে—খেলায় আতুর সাপ ভীষণ বেচালে।
যেন বা নরকে নামে, আবার বাতাসে ফেটে নীলিমার উজ্জ্বল রগড়,
যুগল শরীরে ভাসে···যৌন জলোচ্ছ্বাসে—চুম্বনের চকিত ঝুলনা।

শিবাণী সরকার

সেদিনের শেষক্ষণ

বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে আমরা বসেছিলাম ভিক্টোরিয়ার সবুজ ঘাসে।
আলতো হাওয়া লাগছিল চুলে।
এলোমেলো অনেক কথার ফাঁকে 'ও' আমায় বলেছিল সেই চিরন্তন কথা :
'তোমায় ভালবাসি। যেমন বাসে ওই রোদেপোড়া মাঠ
আকাশের নীল মেঘমালাকে।
যেমন ভালোবাসে বেরঙের প্রজাপতি কৃষ্ণচূড়াকে।
কিম্বা.....'
শেষ করতে দিইনি ওর শেষ কথাটা। বলেছিলাম, (অবশ্যই মনে মনে),
জানি যেমন ভালোবাসা তোমার আত্মীয়, যেমন ভালোবেসে পাবে
আগামী শ্রাবণের হলুদ চিঠি রাঙা মনোময় দিন—
তবু, অন্তত ব্যর্থ হতে দিইনি সেদিনের সেই শেষ ক্ষণটাকে।

শুভঙ্কর ঘোষ

সময় কি অসমাপ্ত জীবনের গান

আর কতকাল এভাবে বেঁচে থাকব ঠিক বলা যাচ্ছে না, আমার সারাটা জীবন
শুধু বিছানায় শুয়ে থাকা, দিগভ্রান্ত কত পথের আঁকিবুকি
আমার অস্তিত্ব জুড়ে
সাহারা অতো ডাকো কেন, সমস্ত কংকাল ঘিরে কার পদধ্বনি
সেগুন দরোজা খুলে প্রেম এলে নাকি
আঃ, ঘুমের ভেতরে উদাসীন দস্যুতা কেন, চতুর্দিকে ইস্তাহার ওড়ে :
'শুভ, শুভ অন্ধ করাঘাত হেনে কি হবে তোমার
আন্দোলিত অন্ধকারে গেঁথো না মালা, ফুলের মূল্য বলো বোঝে ক'জনে'
লৌহ যবনিকা দ্রুত সরে যায়—স্বপ্ন, শুধু পাথরের স্বপ্নে গড়া আমার ভুবন
ওষুধভতি ঘরে আমার সারাটা জীবন টুকরো টুকরো মিশে যাওয়া লেবুর গন্ধ
হুররে, হো হো—বালিগাছ হাঁটে ছাখো, বালিগাছ নিরাময় মধুর ডালিং
হাঁটতে হাঁটতে আমার জঠোরে
তরল তরঙ্গমালা হয়ে প্রস্থানের চিত্র এঁকে যায়
আজকাল নিশ্চিত কিছু দেখতে পাই না—সবই অনুমান
প্রান্তরময়তার আক্রমণে চোখে ছাখো ঘুণ ধরে গেছে, নির্জনতা
নির্জনতা আমার অতো গান গেয়ো না, বুকের ভেতরে কার উতরোল স্মৃতিশিল্প

স্বাগতা, তোমাকে অদ্যাপি অভিনন্দন জানানো হলো না, আর হবেও কিনা
ঠিক নেই
তোমার সমস্ত চিঠি কিডন্যাপ করেছে পিয়োন, মনে মনে ডাকঘরে জেলেছি
আগুন, তবুও চাহিনি তোমার
অব্যর্থ হৃদয়—বিস্তৃত পশমে ঢাকা
দিনযাপনের গ্লানি নাইবা শুধোলে, সমস্তক্ষণ বেতারে শুনছি ঝুলনের
গান--ধোঁয়া ধোঁয়া অসংখ্য ভাঙ্গা ফুলদানীর ঝন্‌ঝনা
কাঠখড় অনেক পুড়েছে, তবু নক্ষত্র বিশারদ নিয়মমাফিক
একবার ক'রে নাড়ী দেখে যাচ্ছেন
মুখে বিধাতার হাসি ও লবঙ্গের স্বাদু ঘ্রাণ, গম্ভীর কৌতুক চোখে—যেন
হয়ে যাবে

রোগমুক্তি, মিছে অস্থিরতা—প্রায় প্রতিদিনই ব্যর্থ সান্ত্বনার মূকাভিনয়
সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে, অথচ না তিনি না কেউই
না, না, কেউ নয় অর্থাৎ সুজনেষু, তোমরা কেউই জানো না, আর কতকাল
বেঁচে থাকব, আমার বেঁচে থাকা স্বপ্নময় শবের সাধনা
আমায় হাত ধ'রে নিয়ে চলো নিয়ে চলো স্বাগতা, ওই শেফালিতলায়
কই, কাছেপিঠে কে আছো হে মাথুর-আলাপী
এবারের চৈত্রে এত বৃষ্টি কেন, প্রায়ই শুনি রিমঝিম রিমঝিম
করমচা জাগানো ছন্দ—বৃষ্টি ! বৃষ্টি ! অহোরহ কার ধ্বনি অলৌকিক স্বর
কিম্বা দিব্য আবাহন
চোখের সামনে উদোম চতুর আকাশ, তবু চোখের জানলাটা অতো দাগী
জালে বোনা ও বন্ধ কেন
কেনই বা অতো হাহাকার
'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে দিয়াছ সম্মান', কেন অতো নজরুলের কবিতা পাঠ
ইনিয়ে বিনিয়ে
বর্ণপরিচয় নাইবা করালে, ফসলের ছবি আঁকা কবে শুরু হবে
রবীন্দ্রসংগীত গাও বিনিদ্র রাতের তারা, ক্ষমাদীপ্ত নার্স—
স্বাগতা, আমার পুড়ে থাক হয়ে যাওয়া বুকে, অভিশপ্ত শ্মশানের রাতে
ব্যথিত জেগে থাকা, আমার কেন জাগা
কেন মোমবাতি নিভে গেলে একবারও চাঁদ উঠবে না, বুকে কেন
মূর্ছার অভিমান অথবা আমার সারাটা জীবনই মূর্ছিত প্রহর
প্রহরী এখনো এলোনা—স্বাগতা, এলে না কেন

ওই শেফালিতলায় বিমর্ষ রোদ্দুর ক্রমশই ফিকে হয়ে যায়
সূর্যগ্রহণ শুরু হলো কবে
উৎসবের পাণ্ডুলিপি লুটিয়ে আছে
কবে থেকে নিঃসঙ্গ লুটিয়ে,—
ছেঁড়া ফুলে পথ ক্লিষ্ট, কে আমায় হাত ধরে নিয়ে যাবে
শেফালিতলায়
স্বাগতা, এখনো এলেনা—তবে সময় কি অসমাপ্ত জীবনের
গান অথবা ব্যাকুল অভিমান ওষুধময় ঘরে

অন্ধকারে ভালোবাসা

শিস দিয়েছ আমায় দেখে—
বেশ করেছ। এবার আমায় ফিরতে হবে
সাত সতেরো কাজের ফাঁকে।
সাত সতেরো কাজের ফাঁকে তোমায় ডাকে আমার মন
ঠিক বলেছ, নিমন্ত্রণ নয় চিঠিতে, নয়তো ফোনে
নিমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ আমার মনে, তোমার মনে
নিমন্ত্রণ মনে মনে। দিন দুপুরে
বাঁশী বাজায় কোন্ সে রাখাল, সুরের মায়া হৃদয়জোড়া
শিস দিয়েছ তাই কি তুমি!
এ যে তোমার কেমন ছল, কান্না কেন—না, না, ছি, ছি
বেশ করেছ
জাগিয়ে আমায় ডাক দিয়েছ,—
বুক-পকেটে তোমার ফটো
অন্ধকারে দেখা যায় না
দেখা যায় না দেখা যায় না রাধাচূড়ার হলুদ ডাল
গর্ভবতী
তোমায় আমি কি যে দেব! বল্লে তুমি, সৃষ্টি করো
তোমায় তবে নোতুন ক'রে সৃষ্টি করার স্বপ্ন দেখি, শিস দিয়েছ
আমায় দেখে, বেশ করেছ, কাছে এসো
এবার আমায় যেতে হবে, তোমার বুকের আন্দোলনে
তোমার চোখের নিমন্ত্রণে গোপন ধ্বনি তুলব ছাখো
ওই ধমনীর গহনছায়ে, ডুবতে এবার লাগছে ভালো
অন্ধকারে জীবন আছে, অন্ধকারে ভালোবাসা!

দেবাশীষ সান্যাল

গভীর রাতে পুতুল খেলা

গভীর রাতে ঘুমোই যখন আমি
ছোট্ট মাটির খেলনা রাজা রাণী
মুচকি হেসে আমার কাছে এসে
সুরসুরি দেয় কান মলে দেয় হেসে;
ওদের কাছে পুতুল তখন আমি
আমিই তখন ওদের রাজা রাণী,
আমার পুতুল আমায় পুতুল করে
গল্প বলে নাচায় দু'ঠ্যাং তুলে
আমি তখন স্বপ্নে উঠি নেচে
মাঝ রাতেতে পুতুল ওঠে বেঁচে॥

শিবশম্ভু পাল

উপহৃত পদ্য সম্পর্কে

একটি পদ্য উপহার দিয়েছিলাম।
তন্নতন্ন করে যদি কোন নগরকোটাল খোঁজাখুজি করে
পাবেনা কিছুতে পাবেনা যেহেতু তুমি
আমার পদ্য পাকিয়ে পাকিয়ে
কণ্ঠনালীতে ফেলে দিয়েছিলে গোপনে।
প্রথমে গলায়, গলার ভেতর থেকে
ক্রমশ চারিয়ে গিয়েছে অন্ধকারে
যে অন্ধকার লেগে আছে চোখে, খোঁপার ফুলেতে, বুকে।
নগর কোটাল খুঁজে পাবেনাকো, তুমি
সুনিপুণ স্মাগলার।
আইনের চোখে ধুলো দিয়ে হাতে উপহার নিয়েছিলে
সমাজবিরোধী আমার দুর্বলতা।

২

সন্দেহ করেছিলে।
কোন কালি দিয়ে পদ্যটি লেখা, সন্দেহ করেছিলে।
অক্ষর দিয়ে সাজানো নিছক? সন্দেহ করেছিলে।
আমি তাই চেয়েছিলাম।
রক্ত এবং কৈশোরকের বিকল্প আজও পদ্যেতে খোঁজা যায়।

আনন্দ বাগচী

তবু এই হাতে

বহুকাল থেকে সব ফস্কে যাচ্ছে মুঠোর ভিতর,
স্বপ্নের ভিতর থেকে, কিছুই থাকছে না কোন খানে
হাতের তাসের সঙ্গে বুকের গভীর ভালোবাসা,
অন্যহাতে ছিটকে যাচ্ছে, জায়গা জমি নিশ্চিন্ত চাকুরি,
উজ্জ্বল আকাশ, জ্যোৎস্না, নিসর্গের বিচিত্র অ্যালবাম
সমস্ত হারিয়ে যাচ্ছে, চতুষ্কোণ শূন্যতার মাঝে
মসৃণ চাবির শব্দ, চাবি ঘোরানোর শব্দ হয়,
সর্বস্ব হরণ ক'রে কারা যেন নিয়ে যাচ্ছে সব।

সমস্তই ফস্কে যাচ্ছে, তবু এই হাতে বহুকাল
বাসের হ্যাণ্ডেল ঠিক ধরা আছে অন্ধ সাড়ে সাতটার লোকাল॥

স্বস্তি চট্টোপাধ্যায়

সকলেই চায় কিছু

প্রত্যেকের অন্তরের নিভৃতে কিছু প্রবণতা থাকে
প্রতিটি মনের কোণে যেমন নিরুদ্দেশ প্রবণতা
প্রত্যেক চোখে যেমন আকাশের নীলরেখা
গাড়ীঘোড়া বাঁচিয়ে পথচলতি বালকের মতো
শখ করে সকলেই কিছু কিছু গান গায়
ঠাট্টা করে, সিনেমার দেবতাদের জন্য অনুরাগ গচ্ছিত রাখে
কেউ কেউ পাতাবাহার চন্দনা ও শিশুদের দেখলে
উচ্ছ্বাসে গড়িয়ে পড়ে, কত হাসি হাসে
কেউ কেউ ভেঙ্গে পড়ে লজ্জাবতী লতিকায়
কেউ বা ভীড় সহ্য করতে পারে না, কেউ পারে
অর্থাৎ সকলেই নাকি নিজেকে লুকোতে চায় কানামাছি খেলায়
সকলেই সকাতরে অবকাশ প্রার্থনা করে
সকলেই লম্বা ছুটি—কাশবন দেওদার সমুদ্রের জল চায়
সকলেই চায়, অন্তত কিছু যেন চায়
কোন এক প্রবণতাকে সযত্নে লালন করে যেতে।

শংকর চট্টোপাধ্যায়

আবিষ্কার

অথচ সুখাদ্য ছিল তবু তুমি গার্হস্থ্য ক্ষুধায়
আমার সকল শস্য গ্রাস করো।
জাগরণ গেল ঢের, কল্পিত ঘুমের পাশে ফেঁটে পড়ে নিষ্ঠুর কামান
তুমি ভুলে যাও খেলা, আলিঙ্গন, পুরাতন চুম্বনগুলির চিহ্ন
উড়ন্ত রুমাল, নৌকা, ব্যভিচার, রক্ত মোচনের জ্বালা
চূর্ণ সম্ভাষণও।

ক্রীড়াতর মানুষের, ব্যবহৃত পুতুলের, বীজাণুবিহীন আত্মা
গোধূলির ধ্বনি কিংবা পর্বতের গান, সব তুমি
তুলে রাখো গোপন সিন্দুকে।
জীবজগতের প্রতি তুমি কোনো সখ্যতা মানো না
আবির্ভাব মাত্র তুমি কেড়ে নাও সকল সম্মান
হাঁ খোলা গহ্বরগুলি সৃষ্টি করো ভবিতব্যতায়
ছড়ানো সংক্রাম হতে, ধ্বংস হতে, তুলে আনো আত্মা নিরাকার।

বড় কোলাহল যায়, ক্ষুধা যায়, ভঙ্গুর পাথর
সহবাস, সন্তানসন্ততি, মাটি, জয়ের মাস্তুল
আমি কি দর্পণ নাকি ? সব চিহ্ন মুছে দেবে পলাতক হাত।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কাপালিকের প্রেম

ঘরের ভেতর এসেই দেখি কাপালিকের ছায়া
ধ্যানস্থা এক সন্ন্যাসিনীর শরীর ঘিরে আছে।
ডাকলে তাকে দেয় না সাড়া, বুকের ভেতর
ঝাউয়ের শাখা ঝিরঝিরিয়ে কাঁপে।

বাইরে আসি কঠিন রোদে দারুণ ঠাসা গলি।
সন্ন্যাসিনীর প্রণয়-লিপি গুমোট হাওয়া পড়ে,
কাপালিকের ভালোবাসায় দেয়াল আঁকা জোকা—
ঘরেতে তার দারুণ বিপদ, বাইরে আকাশ পোড়ে।

কল্যাণ ভট্টাচার্য

কুয়াশার পরিবর্তে

মাঝে মাঝে ইচ্ছেরা প্রাণ পেতে চায়, তবু
মাঝে মাঝে তাদের শিপিংপিল খেতে দিই—
এবং মনে হয় তোমার আকাশের সরস খাঁজগুলিকে
মুঠো মুঠো ভোরের কুয়াশা দিয়ে ভরিয়ে দিই,
তবু অসহায়তা
তাই নিরুপায় হয়ে, বিশ্বাস করো প্রিয়, তাই বাধ্য হয়ে
আমার সব আড়াল দিয়ে তোমার সর্বাংগের লজ্জা
ঢেকে দিতে হয় ;
এবং তখন চার ঠোঁটের সঙ্গমে আহ্নিক সেরে
আমার উপোষী চোখ জলপান করে,
এবং তখন কুয়াশার পরিবর্তে আমার অনুভূতি সব
সরসীকে খোঁজে।

স্বপন দাস

আত্মরতি

আমার রক্তে সূর্য হয়েছে তন্ময়
আমাকে যেতে দাও তাই সেই দুধের
শিবিরে, দ্রিমি দ্রিমি তালে যেখানে
নাচে কোন কোন টাহিতি উর্বশী
হাওয়ায় অস্থির রভস্ উদ্ধার পেয়ে।

আমার হাত ধরো হে সূর্যানর,
আমাকে যেতে দাও আরো একবার
সেই বোধির প্রান্তরে, কোন কোন
অস্ফুট রমণী অধর চাপে মাতাল—
সমুদ্র হয়ে তোমাকে তো বুঝি পিশাচ
সুন্দরী, প্রেমিক মায়ের স্তনজ দুধের
মতো, এবং অ-বর্ণ আলোর অঙ্কনে

ক্রীট হয়ে ফের আহত শৌর্যে বলি ;
তোমার মতো শুধু নিজেকেই ভালবাসি।

শংকর দে

পরপারে দেখা হবে, দেখা হবে

পরপারে দেখা হবে, দেখা হবে প্রত্যাশা কি এতই অমোঘ
না কি স্বেচ্ছাচার
দুজনে রাত্রিতে মিলে মিশে যাওয়া—সিন্ধুদ্বীপ
যেরকম মুঠিতে আমার শক্তকাঠ জ্বলে গেছে, অতিরিক্ত
জ্বলে গেছে প্রগাঢ় ওষ্ঠের মতো সুখ।
ওলোট পালোট করা লেপতোষকে তেমন আর সুখ নেই মানুষের
যৌথচুক্তি আমাদের যতোদিন সরল নিঃশ্বাস
যতোদিন না পর্যন্ত মৃত্যু এসে বলবে পথ ছাড়ো—যেতে হবে
ততোদিন পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে থাকবো একা অশ্রু ও
নিয়তির মুখোমুখি।

ক্রমশই ফুরিয়ে আসছে আমাদের ভুলরাস্তা বেঁকে যাচ্ছে
রৌদ্রের মতন শীতে জ্ঞানশূন্য জ্বরে লেগে হাওয়া
যেরকম মুখশ্রী আমি বহুদিন দেখিনি পলকে
অন্তত ছায়ায় দেখা জোনাকির মতো দূরে আলো
না কি অদূর বিভ্রমে
রক্ত জল হয়ে নেমে আসে হাতের রেখায়।

অর্পিতা রুদ্র

শিউলি-সকাল

আমি পূর্ণ হতে চাইনা আকাশের নিঃসীম অবকাশে,
আমি মুক্তির চিরন্তন স্বর্গে স্তব্ধ রাখব না হিল্লোলিত সত্তাকে।
বেদনামুখর মাটির সাথে
আমার অনুভূতির নদী মিলে সমুদ্র হবে,—
তার তরঙ্গিত আত্মার গভীরে দেখব শাশ্বত সূর্য্যকে।
জানি, পায়ে চলা পথের আঘাতে ফুল ফোটে না,
আশাহত দীর্ঘশ্বাসে বাতাস সুরভি ছড়ায় না সেও জানি।

তবু মাটির সোহাগ ছেড়ে
শূন্যতায় বিলীন হতে চায়না অতৃপ্ত অন্তর।
এখানে শ্রাবণের কান্নায় আছে শিশিরের সান্ত্বনা,
হিমেল হৃদয়ে আসে প্রীতির ফাগুন,
ধুলোর ধুসরতা মুছে দেয়
পিয়ালী নদীর খেয়ালী ছন্দ।
তাই বিষন্ন অপরাহ্নে
কবিতা লিখি স্বর্ণালী-সায়াহ্নের
তিমির তিথিতে তাই কান পেতে শুনি
আগামী ভোরের বিভোর গান।

তপন রায়

স্মৃতি

দাঁড়িয়ে দেহলীপ্রান্তে,
দিন অতিক্রান্ত ;
ঝরে যাওয়া ফুলের সৌরভ।

অলস স্মরণ শুধু
দুকূল প্লাবিত তট
শীতার্ত সকালে।

সে শুধু আলোকের গন্ধ-খোঁজা
নিভে যাওয়া প্রদীপের শিখার
দীন দীপ্তিহীন।

তবু মনে হয় ভোরের মালতী
আর সায়াহ্ন যূথিকার
দীর্ঘশ্বাস,
দেহ দেউলের বিবর্ণ বিলাস।

মৃণাল দেব

মৃৎশকট

ফুলশয্যা কণ্টকিত—দুবছর বাদে ;
তোমার আমার এক হৃৎপিণ্ড খানি—
শত শত এবং পৃথক্।

সন্তানেরা মুছে ফেলে
শ্লেটে আঁকা যোগবিয়োগগুলি
তার সাথে মুছে যায়
হৃৎপিণ্ড, ভালবাসা—
মুছে যাই তুমি আর আমি—
আমাদের সন্তানের কাছে।

অসহিষ্ণু পিপাসারা
পঞ্চায়েতী মোড়লের মত ;
দণ্ডকারণ্যের পথে ঠেলে দেয়
ভালবাসাশীর্ষক মৃৎশকটগুলি।

আদালতে কশ্যপের কুলরত্নগণ
ভালবাসা কেনাবেচা করে ;
সন্তানেরা রক্তে দেখে—
পিতৃস্নেহ ক্ষয়িষ্ণু নিকেল—
নাভিকুণ্ডে ছিঁড়ে যায়—
মায়ের হৃদয়।

দ্রোণাচার্য্য ঘোষ

পথচারী

লিখবো আমি কি, সবকিছু তো আমায় ছেড়ে
অতল শূন্যে বিলীন,
ভবিষ্যতের ঘোড়া তার নেপথ্য হ্রেষা-ধ্বনি
করছে এক প্রতীক আহ্বানের।

চারপাশে ছড়ানো হীরে, মণি-মাণিক্যের
অনাদৃত স্তূপ, পায়ের তলায় ভাঙছে কাঠি
—অজানা এক ছন্দ-রূপের মোহ।
লেখায় লেখায় লেখালিখি সমস্ত এই মন,
ঘর থেকে যে নিজেই বেরোয় তাকে ঘরে তুলবে কে ?—
শুক্রতার নীলপদ্ম তো জলেই ভাসমান !
অপরাহ্নের আলো শুধু কাঁদায় আমায় আকুল,
অতীত তটরেখা কোন্ অন্যপথের যাত্রী ;
সুদূর হাসি সুদূরতায় অথবা ম্রিয়মাণ—
পথচারী, তুমি এবার থামাও তোমার হাসি।

অনিল আচার্য

শূন্যতাবাদ সম্পর্কে একটি ব্যর্থ সনেট

একটি প্রস্তরীভূত নম্র শিলাস্তরে মাথা রেখে
প্রাণের স্পন্দন চাই সফেন সধূম অনুভব,
এখানে নদীর বাঁকে মৎস্য কিছু, ওপাশে যে পথ গেছে বেঁকে,
জলধারা মাৎস্যন্যায় এবং সে পাতাঝরা বনের সৌষ্ঠব।
একটি চিহ্নের মাঝে ব্যর্থশ্বাস প্রাগ-ইতিহাস
সুদূর অতীত জাগে মধ্যরাতে পীড়িত শয্যায়,
কাঁচভাঙ্গা কলধ্বনি, লুটোপুটি মাতাল বাতাস
এবং মার্তণ্ডতৃষা নীরভ্রমে শ্বেতশুভ্র দুগ্ধের ফেনায়

একটি সজলরাত শুভলগ্নে বাসর শয্যাতে বিধৃত,
হতাশার গ্লানি নিয়ে ঘৃণাভরা দুমুখ দু দিকে,
চাঁদেরো আকাশ আছে, পাওয়া যাবে একটি মক্ষীকে ?
বিস্তৃত যে ক্ষুদ্র ডানা নৃত্যপর বুকে তৃষা মনের নিভৃত
একটি সজল তৃষা চাতকের বাণী দিয়ে মূক
নিলীমার বিস্তৃত বুকে মুখ ঢাকে বিশীর্ণ হৃদয়দাবী সুখ।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সাতটি রঙের খেলা

সি-গ্রীন, অক্স ব্লাড্ রেড়, স্কাই ব্লু, মভ,
দীর্ঘ উপোসীর সামনে সদ্য ছিন্ন মেটুলীর মত
এ সব বিষম রং ইতস্তত ছড়ানো ছেটানো—

প্রায় এক যুগ হল ছবি আঁকতে পারছি না
প্রায় এক যুগ হল ছবি আঁকতে পারছি না
সি-গ্রীন, অক্স ব্লাড রেড, স্কাই ব্লু, মভ্,
মেরুন খয়েরী……

—কণ্ট্রাক্ট ফিরিয়ে নিন, আর ছবি আঁকা অসম্ভব
রং দিয়ে ছবি আঁকব কি মশাই
রং দেখলে পাগল হয়ে যাই
রং দেখলে আজকাল বেহেড পাগল হয়ে যাই।

অলোক সিংহ

গৃহবাসী মানুষ আজ আর ফিরে আসে না

আজ আর পৃথিবীতে কোন গৃহবাসী মানুষ নেই—
দু'হাতে শিল কুড়োতে কুড়োতে কখন মাঠের প্রান্তে এসে
সকলেই হারিয়ে ফেলে পুরানো বাসার ঠিকানাগুলো—
তবুও অন্ধকারে নিঃসঙ্গ বাড়ীর চারিধারে স্মৃতিচারী শিল্পীর
বিষন্ন প্রেম রৌদ্র বেলায় আলোর ভুবন খোঁজে।
এখনো তাই বুকের অনেক কাছে স্রোতস্বিনী জ্যোৎস্না
হঠাৎ শ্রাবণে এসে সমস্ত নারীর স্মৃতি অথৈ ব্যথায় হয়
"উজ্জয়িনী" নাম—তবুও, আজ আর পৃথিবীতে কোন
গৃহবাসী মানুষ ফিরে আসেনা—
শুধু অনেক মৃত্যুদিন অঙ্কিত অন্ধকারে জীবনের
প্রতিশ্রুতি খোঁজে—বিদায় নেবার আগে শুধু একবার
বারান্দার হলুদ বেলা থমকে যায় পুরানো মেঘের ছায়া দেখে
—দক্ষিণের জানলা জুড়ে ডাক দেয় অদূরের সাহানা সুর।

রবীন্দ্র গুহ

ত্রিশবছর আগে ও পরে

কারো তরে অপেক্ষা নিরর্থক, আমি কারো জন্য অপেক্ষা করিনা
ত্রিশবছর আগে কারো জন্য আমার জন্য সকালবিকাল
অপেক্ষা করেনি কেউ
'রবীন রবীন আছো ?' বলে ত্রিশবছর আগে
পরিচিত কিশোরী মেয়েরা অবশ্যই কাছে এসেছিল
বদলে নিয়েছিল পুরাতন জুতো ও জাম্পার
কিন্তু কেউ অপেক্ষা করেনি স্বতঃপ্রণোদিত।
বেজায় ভিড়ের ভিতর হেঁটে যেতে-যেতে 'আমাকে চেনো কি তুমি ?'
এই বলে হেসেছিল মণিকর্ণিকা,
শৈশবে আমি শুধু মণি বলতুম
একবার জাম পুকুরের জলে উভয়ে উলঙ্গ হয়ে ফুলের জ্যোৎস্নায়
দারুণ লজ্জা পেয়ে, ভয় পেয়ে, অবশেষে
ভয়ংকর খুশি হয়েছিলুম
ভবিষ্যতে আরো খুশি হব এমনি ধারণা ছিল, অথচ
সীমান্তে অতন্দ্র হতে চাইল না মণি
অর্থাৎ মণিকর্ণিকা
জলের লজ্জার কথা, ভয় ও খুশির সংবাদ
সরাসরি অর্থহীন হল ডাঙ্গার জ্যোৎস্নায়, তবু
ত্রিশবছর পরে মণি অর্থাৎ মণিকর্ণিকার সঙ্গে বৌবাজারে গেলুম
কথা ছিল পরদিন অপেক্ষা করব শ্যামবাজারের মোড়ে
জরুরী প্রয়োজনে
কারো তরে অপেক্ষা নিরর্থক, আমি কারো জন্য অপেক্ষা করিনা
ত্রিশবছর আগে কারো জন্য আমার জন্য সকালবিকাল
অপেক্ষা করেনি কেউ
অপেক্ষায় খুব কি কষ্ট ভয়ংকর ? অপেক্ষায় সংখ্যাতীত জুতোর
পেরেক ফোটে বুকে।
আর দুঃখ, হতাশা, স্মৃতির যন্ত্রণা ?

ক্রমাগত ঘৃণার সঞ্চার দেহে—'বড় রোগা হয়ে গেছো তুমি
তিনদিন তিনরাত্রি প্রতীক্ষার পর'—
নমিতাবৌদির কথা হাসপাতালে শুয়ে
সে অপেক্ষায় সুখ ছিল সুরথদাদার।
তারপর ক্রমাগত কত বিপর্যয় ঘটে গেল উভয়ের বুকে।

কতদিন বাতায়নে দাঁড়িয়ে দেখেছি আকাশ, কিম্বা আকাশের মত
রঙিন চুল্লির ধুঁয়ো
ভাললেগেছিল গান গেয়ে ভিড়ে যেতে মেয়েদের দলে
নদী পথে, ঝর্ণাপাথরে শুয়ে অসম্ভব নারকীয় সুখ,
তাই বলে প্রতীক্ষার প্রশ্ন ওঠে না ;
প্রয়োজনবোধে প্রতীক্ষা করবে পুলিশ
রাস্তার মোড়ে, ঘরের দুয়ারে প্রতীক্ষা করবে বেশ্যারা সুখে
স্বার্থপর ব্যক্তিরা কেউ কেউ প্রতীক্ষা করবে
নির্বাচনী কেন্দ্রের দ্বারে
কদমবৃক্ষের নিচে রাধার প্রতীক্ষা দৃষ্টিকটু
অথবা সন্ধ্যায় ল্যাম্পপোষ্টের ধারে।
যতখানি ভাবা যায় ঠিক ততখানি ভাবতে রাজি আছি
অধিক চিন্তায় ধরে মাথা
এবং ততোধিক গাত্র যন্ত্রণা
ভরসা তাও উপলব্ধি আছে, স্বভাব চরিত্রহীন সমুদ্র কপোত
কখনো ইচ্ছা হয় তোমার বিছানায় শব হয়ে শুই
তোমার শরীরে আমি ধুলো হয়ে উড়ি
দন্তে জলি মাংসের টুকরোর মত সেকেঁবিব !

কবিরা অপেক্ষা করে অনর্থক, আমি কারো জন্য অপেক্ষা করিনা
ত্রিশবছর আগে আমার জন্য সবার জন্য সকালবিকাল
অপেক্ষা করেনি কেউ
তুমি, অপেক্ষা, খণ্ড কৌতূহল
ঘৃণা করি, তোমাকে দারুণ ঘৃণা করি !

অভ্র ঘোষ

অন্বেষণ

অকস্মাৎ কখনও মনে হয়
কঠিন প্রত্যয়ে যুবতীর জিজ্ঞাসা
প্রতিদানে ছেদ চিহ্ন দাবী করি
এ বৃক্ষের পরিণতি কোথায় ?

ভিতরে তোমরা কে আছো
রহস্য-চোখে মৃতদেহে কেন এ শ্রদ্ধা
বাসর-সাজানো বাসি ফুল শুকিয়ে গিয়েছে

ক্রমশঃ বহ্নি চলে যায়
খোঁজ করো, খোঁজ করো পালাতে দিওনা।

মৃণাল হালদার

হৃদয় রহস্য খোলে

শ্যামনগরের গঙ্গার ওপারে উজ্জ্বল আলোগুলি জ্বলে থাকবে শুধু
পতঙ্গের মত ফের ক্রমশ রাতের বুকে বাসা খুঁজে পাবে কিছু পাখি
প্রকাশ্যে সাধ্য নেই সাধারণ অনুভাবনার
নদীর আর্দ্রতীর জেগে রয় শুধু বারংবার।
দুপুর বেলায় যদি বৃক্ষদের ঘটে পদপাত
মহাকাব্যের বুকে কিছুকাল ভেসে যায় তরী
অবশেষে সবকিছু শেষ হয় সারাদিনমান
সন্ধ্যানম্র ইঙ্গিতটুকুও
চন্দনের গন্ধে সেই কেটে গেছে শেষ বিভাবরী
একাকী পারিনা কিছু ঝরে পড়ি লক্ষ্যহীনতায়
কে তুমি সাজিয়ে রাখো যন্ত্রণায় উচ্চারিত মুখ,
পদধ্বনি ভেসে আসে
তুমি তো বোঝনা ঘরে ফিরে কে তোমারে কত ভালবাসে
কার মুখ ন'কিলো মিটার দূরে সতত উন্মুখ।

চন্দন ভট্টাচার্য

হৃৎপিণ্ডের ফ্রেমে ভালোবাসা

হৃদয়ের চারপাশে অসংখ্য যে সব
অসুখী আত্মারা উঁকিঝুঁকি মারছে
আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে তাদের একবার দেখতে চাই !

নিষ্পাপ ভালোবাসাতে যে কলঙ্কের ছাপ পড়ল
তা কি মুছবে আয়ত শুভ্র চোখের জলে !

সমুদ্রের নীল জলের উপর
এখনও যে সব পাখীরা উড়ে চলেছে
তারা কি পারবে আমার হারিয়ে যাওয়া ভালবাসাকে
ছিঁড়ে যাওয়া হৃৎপিণ্ডে বাঁধিয়ে রাখতে।

উৎপলেন্দু চক্রবর্তী

সেই ডাক

আমার বন্য দৃষ্টি ঘর থেকে দৌড়ে পালায়, ছুটতে থাকে গ্রাম্য ছেলের মতো মাঠ থেকে মাঠে আর সেই সাথে আমার বিষণ্ন মন যেন ঘূর্ণিবাতাসের মত কাছের অতীত দিনগুলিকে ওড়াতে থাকে চার পাশে ছেড়াপাতার মত।

সেই দুপুর-সেই উত্তপ্ত সূর্য মাঠের ওপর এসে পায়রার মতো গম্ভীর স্তব্ধতায় 'তা' দিতে থাকে উৎসাহে শিমুলের বন থেকে দূরে সে এক বর্ষিয়সী বটগাছ অমসৃণ দেহ নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ছায়া দিয়ে কাঁথা বোনে।

গাছের পাতায় পাতায় জেগে ওঠে জড়ানো কণ্ঠ স্বর আর গাঢ় অতীতের প্লাবনে ডুবে যাবার একটানা গান,

নীরবতার স্বচ্ছ কুয়াশা ঢেকে ফেলে গ্রাম-নদী-ঘাট—হঠাৎ কোন ফাঁকে মাঠ আর মাঠের আকাশ ছিদ্র করে ছুটে চলে এক তীব্র শিস—সেই ভুলে যাওয়া ডাক—ছোট বেলায় বন্য ছিলাম, গ্রাম্য ছিলাম এমনি করেই হেনাদের দরজার সামনে দিয়ে ছুটে যেতে যেতে জানিয়ে যেতাম : আমি যাচ্ছি ! তুমিও এস।

দীপক সান্যাল

পাখিটার নাম দুঃখ বা ঘৃণা বা ভালবাসা

পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ ও ঘৃণাকে এক জায়গায় জড়ো করে ভালবাসতে বাসতে যদি একটা পাখির জন্ম দেওয়া যেত, আমি পাখিটাকে পুষতাম। আস্তে আস্তে খাইয়ে দাইয়ে বড় করতাম।

পাখিটার নাম হতো দুঃখ বা ঘৃণা বা ভালবাসা।

তোমার-আমার মিলন মুহূর্তগুলো ঝগড়া চীৎকার মান অভিমানগুলো জড়ো করে যদি একটা পাখির জন্মে দেওয়া যেত!

আমি পাখিটাকে যত্ন করে পুষতাম।

একটা খাঁচায় বন্ধ করে রাখতাম। মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিতাম, উড়ে ফের নীড়ে ফিরে আসত।

তারপর? তারপর আর কি, পাখিটা একদিন মারা যেত।

সাফোর কবিতা / অনুবাদঃ পার্থ রাহা

তোমার স্তনের বৃন্ত

তোমার স্তনের বৃন্ত আজো যদি ভিজে ওঠে দুধে
অদ্যাপি গর্ভের রক্তে ভবিষ্যের জাতক যদি আদি
আতপ্ত রাত্রি স্বাদ গ্রহণীয় মনে করে ভ্রূণের আমোদে
অতীন্দ্র আমার মাংস আবার আবার পাবে যদি

তাহলে কি স্থির পায়ে—অত্যুজ্জ্বল অগ্নির বিশ্বাসে
আবার কখনো যাব অন্য এক বাসর শয্যাতে
প্রখর রৌদ্রে, ঝড়ে, ঝড়ের আমগ্ন নিঃশ্বাসে?
না, যাওয়া হবেনা আর, শুধু নিষ্ঠ সময়ের হাতে

মৃত্তিকার গর্ভজাত হাজার ক্ষতের হিহ্ন মুখে
স্তনে ও মাংসের ভাঁজে বয়সের প্রাজ্ঞ উপহার
প্রেমেরও দেবতা আজ অপ্রস্তুত পুষ্পশর বুকে
বিদ্ধ করে মৃত্যুভয়—রমণীর মৃত্যু ব্যথার

পুণ্য দেবে, বিনিময়ে লুণ্ঠন করে আমার···আমার···
না, আহা অতঃপর উজানের প্রদোষের নদী
সঙ্গীতে সঙ্গীতে প্রশস্তি সেই অপরূপার
মধুর বিধাক্ত স্তন—কার আলোর আরতি।

বীরেন্দ্র দত্ত

কবি কবিতা কবিতাপত্র

আমি পঞ্চাশ আর ষাট দশকের কথা বলছি। আজ থেকে বছর দশেক আগের কোন একটা ছুটির দিন ধরা যাক। শীতের সকালে পাতলা রোদ আর ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে জড়িয়ে মোহিতের বাড়ি এসে গেলাম। একটু পরেই হয়ত এলো শিবশম্ভু। কোন কোনদিন মতি বা আর কেউ। আমরা হাঁটতে হাঁটতে সুনীলের বাড়ি শ্যামবাজারে। সদ্যোজাত কৃত্তিবাসের অফিস যদি কিছু থাকে, তো ওখানেই তখন। সুনীলের সে সময় হয়ত ঘুম-চোখ। সামান্য একটু পেস্ট দাঁতে চেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দলে। হালকা মেজাজে হাঁটতে হাঁটতে শ্যামবাজার কফি হাউসের কাছাকাছি ফুটপাতে, তারপর কখন যেন কোলাহলে ভাসতে ভাসতে সোজা দেশবন্ধু পার্কের সবুজ ঘাসে ধোয়া এক কোণে। তখন হয়ত ইতস্তত ছড়ানো শিশিরের উজ্জ্বল বুকে রোদ লুকোতে শুরু করেছে।

আমরা সীমাবদ্ধ পরিসরে এখানে ওখানে এদিক-ওদিক মুখ করে বসে পড়তাম। তারপর কেউ সচেতন থাকতনা, কখন যেন আড্ডাটা বড় হয়ে গেছে। আড্ডার সে অবয়বে আর লঘুতা নেই। রীতিমত ভারী, কখনো কখনো ঈষৎ গম্ভীর বা, এক এক করে শক্তি অনুভবের উত্তেজনায় কবিতা পড়ল, পড়ার উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তন্ময় দত্ত। ভারী গলায় সসঙ্কোচে সুনীল। একের পর এক মোহিত, শরৎ মুখোপাধ্যায়, শিবশম্ভু, দক্ষিণ কলকাতা থেকে আসা তারাপদ, সমরেন্দ্র, শংকর, প্রণব, উৎপল ইত্যাদি। মাঝে-মধ্যে দীপক, সন্দীপন, ইন্দ্রনীলও শোনাতো। আড্ডায় গল্পও পড়ত অনেকে। আলোচনার প্রয়োজনে শুধু কবিদের কথাই বললাম।

আড্ডা জমানো, কবিতা পড়ার ও শোনার মেজাজ থেকেই একদিন এলো কৃত্তিবাস কবিতাপত্র। শুধুমাত্র কবিদের পত্রিকা। এর আগে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' তখন তার জীবনের ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চারপাশের খ্যাত-অখ্যাত তরুণ কবিদের কাছে মোক্ষধাম কৈলাস বিশেষ। কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকার অনুকরণ নয়, বলা যায়, স্বভাবী অনুসরণে 'কৃত্তিবাস' স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা দিল। আর আমি যেদিন থেকে এই গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত হয়েছি, সেদিন থেকেই

দেখেছি, যে কবিতাগুলি সেই সব সপ্রাণ আড্ডায় পড়া হ'ত, তার অনেকগুলি 'কৃত্তিবাসে' পত্রস্থ হ'ত। নিজেদের কাগজ, আপন প্রিয়তম ঘরটির মত। নিজের সন্তানকে সেখানে রেখে বার বার গোপনে নিরীক্ষণ করা! কি অপূর্ব এক অদৃশ্য আয়োজনহীন মায়া মমতা, আত্মীয়তা ছিল কবিদের সঙ্গে এ পত্রিকার।

এখনকার কবিতাপত্র ঠিক তাই, 'তীব্র, উদাসীন, উন্মত্ত, ধীমান, ক্রুদ্ধ, সন্ত্রান্ত, ক্ষুধার্ত, শান্ত, বীটনিক, ভয়ঙ্কর, মগ্ন, চতুর, সৎ, ভূতগ্রস্থ, ধার্মিক ও অতৃপ্ত কবিদের ব্যক্তিগত রচনা, কবিতা ও বিস্ফোরণ' এর নির্জন-নির্বাচিত ভূমি। পঞ্চাশ-ষাট দশকের যে সব তরুণ কবি কবিতা লিখেছেন, তাঁরা বুদ্ধদেবের ঐতিহ্য সম্পন্ন 'কবিতা'-ত্রৈমাসিক অনেকেই ভিড় জমিয়েছিলেন এক এক করে। সুতরাং 'কবিতা' পত্রিকার বিরুদ্ধে নয়, উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্যে 'কৃত্তিবাস'-এ কবিগোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করলেন। নতুন শিরা-উপশিরায় আচ্ছাদিত উজ্জ্বল নব মুখ।

'কবিতা' পত্রিকার স্পষ্ট প্রেরণা আর 'কৃত্তিবাসে'র উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে পঞ্চাশের শেষ থেকে ষাট দশকের আজ পর্যন্ত দুরন্ত এক হাওয়া বইয়েছে। একথা আর কেউ স্বীকার না করুক, আমার ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করতে ইচ্ছে করে। কারণ এই সময়-পরিধিতে যে সব তরুণ কবিদের কবিতাপত্র প্রকাশিত হ'য়েছে সচেতন পাঠক হিসেবে কবিদের সান্নিধ্যে ও পত্রিকার স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটিরই জন্মের সাক্ষী আমি। প্রবল সৎ উত্তেজনা মাতালের মত দাপাদাপি করেছে তরুণ কবি বন্ধুদের মধ্যে, আর ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছে একের পর এক কবিতা সংক্রান্ত পত্র ও কবিতা পত্র। কবিপত্র, শতভিষা, সমুখ, পূর্বমেঘ, ধ্রুপদী, সীমান্ত, অধুনা, ছাড়পত্র, ইমণ, স্বাক্ষর, অবাচী, বাংলা কবিতা, হাংরি জেনারেশন, কবিতা পরিচয় ইত্যাদি। সম্পূর্ণ স্মৃতির আশ্রয়ে নামগুলি বললাম, তাই বয়স অনুযায়ী সাজানো গেল না। এ পত্রিকাগুলির মধ্যে অনেকে এখনো কোনরকমে টিকে আছে, কারোর মৃত্যু অনেক আগেই ঘটে গেছে, কারোর বা নাভিশ্বাস। কেউ হয়ত আরো অনেক দিন বেঁচে থাকার অক্ষম গর্বে ক্রম-দুর্বল। এটাই স্বাভাবিক, বিশেষত কবিতাপত্রের পক্ষে। সম্পূর্ণ কবিদের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশে কবিতাপত্রের আয়ু বেশীদিন রাখা যায় না। কিন্তু পূর্বসূরী পত্রিকাগুলির কথা চিন্তা করেও তরুণ কবিবন্ধুরা এতটুকু উদ্যমহীন নন। কোথাথেকে যেন মাঝে মাঝে সশব্দে ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলে দেওয়ার মত তুমুল হাওয়া আসে। ষাটের দশকের এ সময়টা ঠিক তাই। কবিতাপত্রকে নিয়ে যেন বিবাহ বাসরের মাতামাতি শুরু হয়েছে। প্রথমে শক্তির, পরে মৃণালের সম্পাদনায় কবিতা সাপ্তাহিকী, শক্তির সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা, সামসুল হকের কবিতা পাক্ষিক, শান্তি লাহিড়ী ও বিমল রায়চৌধুরীর যুগ্মপ্রচেষ্টায় পনেরো দিন বয়সী কবিতা দৈনিক, সুশীল রায় ইত্যাদির কবিতাঘণ্টিকী আমাদের মত পাঠককুলকে রীতিমত একটুও দম ফেলার সময় দিচ্ছে না। আমরা হাঁপিয়ে উঠছি। তার ওপর সদ্যোজাত কবিকুল পরিচালিত অন্তরের আবির্ভাব আমাদের আরও সজাগ করে তুলেছে।

কিন্তু রেষারেষি নয়, রীতিমত কবিতা নিয়ে চিন্তা করা—যে ভাবে হোক। এ চিন্তার মূলে আছেন তরুণ কবিরা। ফসল তাদের এবং তা একান্ত ব্যক্তিগত আর এই ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দুঃখ-উল্লাস, রাগ-ভয়, প্রেম-প্রেমহীনতা, আত্মহত্যা-জীবনায়ন এক কথায় ভয়াবহ বোমার অন্তর্নিহিত জটিল রাসায়নিক দ্রব্যের মত মিশ্রনের ক্ষমতা নিয়ে কবিতাবলী আমাদের সামনে আসছে বিবিধ বিচিত্র কবিতাপত্রের মাধ্যমে। কৃত্তিবাসের বাইশ সংকলনে সম্পাদকীয় মন্তব্যই আমি মানি : "এসব দেখে শুনে ভয়ে শিউরে উঠে কোনো অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু ভালো করে খুঁজে দেখলুম, এজন্য মনের মধ্যে একটা চাপা হাসিখুশিই রয়ে গেছে! ...কলকাতায় কবিতা ছাড়া আর কোন কথা নেই এখন, কবি ছাড়া আর কোনো মানুষ নেই এবং প্রত্যেক কবিই সশস্ত্র। একটা বিপুল উত্তেজনা আর সাড়া অনুভব না করে পারা যায় না। দেশের দুঃসময়ে কবিতা বেশী লেখা হয়। এখন দেশ জুড়ে কবিতা।"

এত কবি, কবিতাপত্র আর কবিতা চারপাশে পেয়ে আমি তাল রাখতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠি ঠিক, হয়ত মাঝে মাঝে কিছুটা অস্বস্তি বা অস্থিরতা দেখা দেয়, কিন্তু বিরক্ত হইনা। বিস্মিত হই, গায়ে কেমন গোপন রোমাঞ্চ লাগে। দুটো দশক বাংলা নতুন কবিতার ইতিহাসের পাতায় হয়তো হিজিবিজি কলরব মুখর, কখনো বা ক্লান্ত মনে হবে, কিন্তু তরুণ, নতুন অথচ প্রতিশ্রুতিবান কবিদের ঝকমকে মুখ দেখতে পাব। উদ্ভাসিত অথচ বিরক্ত, যন্ত্রণা-কাতর অথচ শান্ত এই বিরোধে বাংলা কবিতার সান্নিধ্য পাব। কবিতাপত্র সে মুখ দেখাবে। মাঝে মাঝে মনে হয় কবিতা ও কবিতাপত্রে আমরা শুধু নিজেদের দেখি না কবিরাও সমবেতভাবে অন্য কবিবন্ধুর মুখমণ্ডলগুলি দেখতে দেখতে নিজেদের

স্পষ্ট চিনতে পারার মত বিশ্বাস অর্জন করেন। কবিতাপত্র কবিদের সেই নির্জন দর্পণ।

কবির সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক একান্ত ব্যক্তিগত। সমালোচকরা যতই মুখ ভ্যাংচান না কেন, একমাত্র স্বভাবী চতুর পাঠক ছাড়া (তাও মুষ্টিমেয়) সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বেনামে দখল করার অধিকার কারোর নেই। যন্ত্রণা আর অবিশ্বাস থেকে কবিতার জন্ম, সুর আর মায়া থেকে কবিতার মুক্তি, কবিদের গোপনতম বাসনা থেকে, নিজেরই স্বাদ গ্রহণ করার সুবিপুল অনহনীয় উন্মাদনা থেকে কবিতার প্রকাশ। কবিতাপত্রে তাই কবিরা একত্র পাশাপাশি, কখনো বা মুখোমুখি বসতে পারেন, আলাপ করতে পারেন, কখনো বা নির্জন নিঃশব্দ থেকে বিষন্নতায় মাথা নোয়াতেও পারেন। কবিতাপত্র কবি ও কবিতার সঙ্গে আত্মীয়তার সঙ্গে যুক্ত। ফটোর নেগেটিভের সঙ্গে যার ফটো তোলা হ'ল, তার যেমন সম্পর্ক—ছায়া-কায়ার, রক্ত-মাংস-মজ্জার সঙ্গে প্রাণ, প্রেম-আত্মার।

কথাগুলি মনে হয়েছে সাম্প্রতিক দু'টি দশকের কবিদের একান্ত সান্নিধ্যে থেকে। আমি এক পত্রিকার সম্পাদককে জানি, কোন এক কবিসম্মেলনে তরুণ প্রতিষ্ঠিত কবি তাঁর কবিতা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটি ভাল লাগায় তা প্রায় ছিনিয়ে নেন পত্রিকায় ছাপার জন্যে। কবিতাপত্রের বিশুদ্ধ আত্মা এইভাবে কবিদের দ্বারা, কবি-সম্পাদকের জুহুরি বিদ্যায় গড়ে উঠত।

আমি বিশ্বাস করি, কবি ছাড়া কোন কবিতা পত্রিকার সম্পাদনা, প্রকাশনা সম্ভব নয়, বরং না হওয়াই ভাল। কৃত্তিবাসের কথাই ধরা যাক সম্পাদক হিসেবে সুনীলের অবর্তমানে শরৎমুখোপাধ্যায়কে দেখেছি, বা এককালে প্রণব, দীপক, মোহিত, শিবশম্ভু, তারাপদ ইত্যাদি বহু কবিদের দেখেছি কৃত্তিবাস প্রকাশনায় যৌথভাবে কি অন্তরঙ্গ এরা। কবি না হলে কবিতাপত্রের আত্মা গঠন সম্ভব নয়। তাই বর্তমানের বাংলাদেশে কবিরাই সম্পাদক, প্রকাশক, প্রুফরিডার। সময়, পয়সা আর ব্যবসাবুদ্ধি নেই বলে, তা না হলে বোধ হয়ত প্রেসম্যান আর দপ্তরিও হয়ে যেতে পারত। কারণ কবিতাপত্রকে সুন্দর হতে হবে এবং সমস্ত দিক দিয়ে। তা না হলে কবিতাপত্র কবিদের মুখপত্র হবে না, অন্য কিছু হবে হয়ত।

আজকাল 'সম্পাদকীয়' লেখা উঠে গেছে। কবিতাপত্রে থাকেই না। না থাকাই আমার মতে ভাল, কারণ কবিতাগুলিই তো পত্রিকার মুখ্য, সম্পাদকের পত্রিকা প্রকাশের বাসনা। পত্রিকার কিছু যদি ঘোষনা থাকে স্বাতন্ত্র্য বা অহংকার, প্রীতি বা দাবী থাকে তা কবিতাগুলি পাঠেই সচেতন পাঠক বুঝবেন আলাদা সম্পাদকীয় দিয়ে পাঠকদের নির্বোধ প্রমাণ করা অপমানকর। তবু কবিতা, কৃত্তিবাস, কবিপত্র, ধ্রুপদী ইত্যাদি পত্রিকার কোন কোন সংখ্যায় সম্পাদকীয় বক্তব্যও থাকে সেটা আমার মনে হয়, সম্পাদকীয় নয়, একধরনের আঘাত। সচেতন কবিতা পাঠকদের কাছে নতুন কিছু বলার চেষ্টা যা তাঁদের সংকলিত কবিতার কোন কোন দিক থেকে দেখা দিতে পারে। কৃত্তিবাসের কথা বলছি। কৃত্তিবাসের সম্পাদকীয় মূলত কবিরই ব্যক্তিগত কথা যা সমস্ত তরুণ কবির ব্যক্তিগত কথা হয়ে থাকে তাঁদের কবিতায়। সুনীলের অবর্তমানে সম্পাদনার কাজে শরৎ মুখোপাধ্যায় একবার সম্পাদকীয়তে বলেছেন, 'সত্য কথা সার্থকভাবে বলতে চাই বলেই আমরা কবিতা চর্চা করছি। ভাবনার ও বেদনার শুদ্ধি রক্ষা করা, কোনো সৎ কবির কাছে অবশ্যই পাঠকের কাছে সাময়িক কর্ণরঞ্জনের চেয়ে অধিকতর কাম্য।' একটি প্রতিষ্ঠিত কবিতাপত্রে কবিদের মুখ্য ঘোষনা ও লক্ষ্য এখানেই।

কৃত্তিবাসের যে কোন সম্পাদকীয় আমার মতে সব সময়েই উল্লেখ্য ঘটনা। অন্য পত্রিকায় তা থাকেনা। এটাই ভাল। কারণ নিয়মিত সম্পাদকীয় লেখায় কবিদের অসুবিধে আছে। ব্যবসার কাগজ ব্যবসায়ী লেখকদের থেকে কবিদের ব্যক্তিগত অনুভব, অন্তর-সংলাপ, বিষন্নতা, আত্মহনন—সব কিছুই শুদ্ধ, আত্মার মত চিরকালের সতন্ত্র। কথাগুলি বললাম কারণ বাংলাদেশের সমস্ত তরুণ কবি প্রায় সব কবিতাপত্রেই লিখেছেন। বাছ বিচার তেমন নেই। যেখানে আছে ব্যক্তিগত আক্রোশ ছাড়া কিছু নয়। অন্তত এখনো তা ই দেখছি। সেখানে সম্পাদকীয় লিখে পত্রিকার স্বাতন্ত্র্য বোঝানো অসম্ভব এবং হাস্যকর।

পঞ্চাশ ষাট দশকের বাংলা তরুণ কবিদের সংঘবদ্ধ পত্রিকা প্রকাশকে আমরা যতটা সয়ে নিতে পারছি পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত কবিতা ততটা সহনশীল কিনা লিখতে লিখতে শেষে এসে সেই কথাটাই মনে পড়ছে। অনেক কোলাহল এপাশ ওপাশ থেকে তরুণ ও নবজাত কবিরা কবিতা পত্রে ধ্বনিত করছেন কিন্তু সব নিশ্চয়ই আমাদের প্রীত করছে না। করবে, এ আশাও করিনা তবু কবিতা নতুন হয়ে উঠুক এ প্রচেষ্টা প্রত্যেক কবির মধ্যে না থাকলে কবির কবিতা শুধু নয়, কবিতাপত্রে অরুচি এসে যাবে। আমি বিশ্বাস করি, বাংলা দেশে নতুন কবিতার সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি তিরিশের কবিদল থেকে সরে এসে নতুন কবিতার আস্বাদ পেতে সুরু করেছি। কবিতাগুলি সে নতুনত্বে পরিষ্কার শরীর নিক, স্বভাবী পাঠক হিসেবে এই আশা বর্তমান ও ভ্রূণ কবিতাপত্রগুলির কাছে রইল।

With best compliments from :

Great Neon Sign Co.

46, Gouri Bari Lane, Cal.-4

Works : **DUM DUM**

Manufactures of Neon sign, plastic sign, electric sign and lighting display.

দত্ত অপটিক্যাল হাউস

৮।২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

(শিয়ালদা স্টেশনের কাছে)

আসুন, নিখরচায় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে চোখ দেখান এবং মনের মত চশমা বেছে নিন।

চোখ দেখার সময় : বিকেল ৪টা—৬টা

বন্ধ : রবিবার সম্পূর্ণও সোমবার দুপুর ১—৩০ মিঃ পর্যন্ত।

অন্বর পর্ষদের পক্ষ থেকে অভিজিৎ সরকার কর্তৃক ৬৭।২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ও শশাঙ্ক শেখর হাজরা কর্তৃক মহাশক্তি আর্ট প্রিন্টার্স, ২২।এ বৃন্দাবন বোস লেন, কোলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৫০ পয়সা